ক্যারিয়ার গঠনের উপাদান ও কৌশল

ইউনিট 2

ভূমিকা

ব্যক্তি জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং জীবন ব্যাপী কর্মসংস্থান ও অভিজ্ঞতার সম্মিলিত রূপই ক্যারিয়ার। ক্যারিয়ার সম্পন্ন মানুষ দেশ ও জাতির সম্পদ। ব্যক্তির এই ক্যারিয়ার আপনা আপনি গড়ে ওঠে না। এর জন্য প্রয়োজন ধারাবাহিক প্রচেষ্টা। এর পাশাপাশি প্রয়োজন কিছু প্রয়োজনীয় গুণ ও দক্ষতার অধিকারী হওয়া যাকে আমরা ক্যারিয়ার গঠনের উপাদান ও কৌশল বলে অভিহিত করতে পারি। এই অধ্যায়ে ক্যারিয়ার গঠনের উপাদান ও কৌশল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-২.১ : ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতামূলক মনোভাব
পাঠ-২.২ : আত্ম সচেতনতা ও আত্মবিশ্বাস :গুরত্ব ও উন্নয়ন
পাঠ-২.৩ : দৃঢ় প্রত্যয় : গুরুত্ব ও কৌশল
পাঠ-২.৪ : শ্রদ্ধাবোধ, পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও আন্ত:সম্পর্ক
পাঠ-২.৫ : আইনের প্রতি শ্রদ্ধা ও দেশপ্রেম
পাঠ-২.৬ : নাগরিকতা ও সুনাগরিকের গুণাবলি
পাঠ-২.৭ : নেতৃত্ব, নেতার গুণাবলি ও দায়িত্ব
পাঠ-২.৮ : প্রেষণা, প্রেষণা চক্র ও প্রেষণার বৈশিষ্ট্য
পাঠ-২.৯ : প্রেষণার প্রকারভেদ ও ক্যারিয়ার গঠনে প্রেষণার গুরুত্ব
পাঠ-২.১০ : আগ্রহ ও মনোযোগ এবং ক্যারিয়ার গঠনে আগ্রহ ও মনোযোগের গুরুত্ব
পাঠ-২.১১ : মনোযোগের বৈশিষ্ট্য, গুরুত্ব ও মনোযোগ বৃদ্ধির উপায়
পাঠ-২.১২ : আবেগ, আবেগের প্রকারভেদ এবং আবেগের প্রভাব
পাঠ-২.১৩ : ক্যারিয়ার গঠনে ইতিবাচক আবেগ ও চাপ নিয়ন্ত্রণের কৌশল
পাঠ-২.১৪ : ক্যারিয়ার গঠনে সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতা : ভূমিকা ও কৌশল
পাঠ-২.১৫ : সমস্যা সমাধান এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ
পাঠ-২.১৬ : সময় ব্যবস্থাপনা (Time Management)
পাঠ-২.১৭ : শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা
পাঠ-২.১৮ : নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গি : গুরুত্ব ও উপায়

পাঠ-২.১ ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতামূলক মনোভাব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি কী তা বলতে পারবেন।
- ক্যারিয়ার গঠনে প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতামূলক মনোভাবের ধারণা ব্যক্ত করতে পারবেন।
- প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতামূলক মনোভাব কীভাবে ক্যারিয়ার গঠনে সহায়ক ভুমিকা পালন করে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ক্যারিয়ার গঠনের অন্যতম উপাদান হল ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি। জীবনে উন্নতির শিখরে পৌঁছাতে চাইলে বা সমৃদ্ধ ক্যারিয়ার গঠন করতে চাইলে প্রথম প্রয়োজন ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি। নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন লোক কখনও সামনের দিকে অগ্রসর হতে পারে না বা জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। তাই ক্যারিয়ার গঠনে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির পাশাপাশি প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতামূলক মনোভাব গঠন করা অত্যাবশ্যক।

বন্ধুরা, আসুন প্রথমে আমরা দৃষ্টিভঙ্গির সাথে অনুরাগের পার্থক্য কতটুকু তা জেনে নেই। সাধারণ অর্থে আমরা অনেক সময় দৃষ্টিভঙ্গি এবং অনুরাগকে একই অর্থে ব্যবহার করি। কিন্তু দুয়ের মধ্যে সুক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। অনুরাগকে আমরা সব সময় ধনাত্মক (Positive) বলতে পারি। অর্থাৎ কোন বিশেষ বস্তুর প্রতি বা ব্যক্তির অনুরাগ আছে বলতে, তাকে আমি পছন্দ করিঃ এটা বোঝাতে চাই। কিন্তু মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গি ধনাত্মক বা ঋনাত্মক দুই-ই হতে পারে। এখানে আমরা দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক দিক বা ধনাত্মক দিক আলোচনা করবো। যেমনঃ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ভাল মনোভাব থাকতে পারে, এর পেছনে শিক্ষকদের আদর, ভালবাসা, স্নেহ মায়া ও সহযোগিতা আছে- তাই নয় কী? সুতরাং শিক্ষকের প্রতি শিক্ষার্থীর এই মনোভাব বা চিন্তা খুবই সুখকর। এটা ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি। আপনি যে কাজই করুন না কেন, তার প্রতি আপনার আন্তরিকতা বা দরদ থাকতে হবে। সেটা হবে ক্যারিয়ারের প্রতি আপনার ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি।

চলুন বন্ধুরা, এবার প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতামূলক মনোভাব নিয়ে আলোচনা করি। প্রতিযোগিতার মাধ্যমেই আমাদেরকে চাকুরি জগতে টিকে থাকতে হবে এবং সেই প্রতিযোগিতা হবে ইতিবাচক। যারা ইতিবাচক প্রতিযোগিতা ও অন্যের প্রতি সহযোগিতামূলক আচরণ করবে তারাই ভবিষ্যত জীবনে সুন্দর জীবন যাপন করবে এবং সুন্দর ক্যারিয়ার গঠন করে সুখ-সমৃদ্ধি লাভ করবে। তাহলে বন্ধুরা বলুনতো, প্রতিযোগিতা বলতে আমরা কী বুঝি ? আর সহযোগিতা বলতেই বা কী বুঝি? প্রতিযোগিতা বলতে বোঝায় অন্যের সাথে পাল্লা দেয়া। এই পাল্লাতে কেউ হারবে কেউ বা জিতবে। এমন পরিস্থিতিকে বলা হয় প্রতিযোগিতা । যেমন ধরুন, আপনি আর আপনার বন্ধু রুহি এক সাথে পড়াশোনা করেন। পড়াশুনার সাথে দুই জনের মধ্যে মনে মনে একটি প্রতিযোগিতা তৈরি হয়েছে। আপনি চান পরীক্ষায় ১ম স্থান অধিকার করবেন বা ফাস্ট হবেন। রুহিও চায় সে ফাস্ট হবে। মনে মনে এ আশা পোষণ করে দু'জনে রাত-দিন অধ্যয়নে রত থাকাই হলো ইতিবাচক প্রতিযোগিতা। তাহলে সহযোগিতা কী ? ধরুন, আপনার বন্ধু রুহি আপনার কাছে একটা গ্রামার বই ধার চাইল, আপনি তাকে বইটা দিলেন, এটা হলো বন্ধুর প্রতি বন্ধুর সহযোগিতা। অন্য সময় বন্ধু রুহি আপনাকে পেন্সিল বা কলম দিয়ে সাহায্য করলো বা টিফিন দুজনে ভাগাভাগি করে খেলেন এগুলো হলো সহযোগিতামুলক আচরণ। বন্ধুর বিপদে বন্ধু এগিয়ে আসবে এটাই স্বাভাবিক- এটাই হলো সহযোগিতামুলক মনোভাবের উদাহরণ।

বন্ধুরা, আপনারা বড় হয়ে যখন ক্যারিয়ারের জগতে প্রবেশ করবেন তখন এ ধরনের ইতিবাচক প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতামুলক মনোভাব ধারণ করবেন। তাতে সমাজে ও কর্মক্ষেত্রে অন্যদের শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও আস্থা সহজেই অর্জন করতে পারবেন। ফলশ্রুতিতে আপনি হয়ে উঠবেন একজন দক্ষ ক্যারিয়ার সম্পন্ন স্বনামধন্য একজন কর্মজীবী মানুষ। যাকে তার অধীনস্থ বা অন্যান্যরা শ্রদ্ধায় ও ভালবাসায় সিক্ত করবে। কর্ম পরিবেশ হয়ে উঠবে আরও অধিকতর মনোমুগ্ধকর ও আরামদায়ক। আর একটা উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি আপনাদের নিকট আরও পরিস্কার করে তুলে ধরা যায়। বন্ধুরা, ধরুন বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় আপনি বাংলাদেশের পক্ষে খেলছেন। আপনার প্রতিপক্ষ দেশ হচ্ছে ভারত। আকস্মিকভাবে দ্রুতগতিতে আসা বলের আঘাতে আপনার প্রতিপক্ষ ক্রিকেটার আঘাতপ্রাপ্ত হলো। আপনি পাশে ছিলেন,

এবার আপনি কী করবেন? নিশ্চয়ই আপনি তাকে গিয়ে ধরবেন, তার পাশে গিয়ে দাঁড়াবেন, তাঁকে প্রয়োজনীয় জিনিস বা উপদেশ দিয়ে তাৎক্ষণিক সাহায্য করার প্রচেষ্টা চালাবেন। এটাই হলো সহযোগিতামূলক আচরণ। মনে রাখবেন, যে কেউই বিপদে পড়লে বা অসুবিধায় পড়লে তার পাশে গিয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করাটাই হলো সহযোগিতামূলক মনোভাব। প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতা আপাত দৃষ্টিতে একই মনে হলেও শব্দ দু'টির মধ্যে অনেক পার্থক্য বিদ্যমান। প্রথমটি হলো - কাজ করে প্রমাণ করা, বস্তু বা সামগ্রী বা অর্থ দিয়ে সাহায্য করা এবং অন্যটি হলো মৌখিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করা- দ্বিতীয়টাতে আবেগ রয়েছে এবং প্রথমটাতে আবেগ এর মাঝে কাজের মাধ্যমে সহযোগিতা রয়েছে; বুঝলেন বন্ধুরা?

আসুন বন্ধুরা, এবার আমরা নিজেরা চিন্তা করে নিচের ছকটি পূরণ করি (৫টি করে উপায় লিখি)-

ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে অভ্যস্থ হওয়ার উপায়	প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব গঠনের উপায়	সহযোগিতামূলক মনোভাব প্রদর্শনের উপায়
১. ২. ৩. ৪. ৫.	১. ২. ৩. ৪. ৫.	১. ২. ৩. ৪. ৫

সারসংক্ষেপ

ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বলতে ব্যক্তির কোন বিশেষ বস্তু বা ধারণার প্রতি বিশেষ প্রতিক্রিয়াকে বুঝানো হয়। প্রত্যেক দৃষ্টিভঙ্গির একটি বস্তুগত দিক আছে। বিশেষভাবে বলতে গেলে কোন বস্তু ব্যক্তি বা ধারণা সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি বা মনোভাবে ধনাত্মক (Perfectly positive) থেকে পুরোপুরি ঋনাত্মক (Perfectly negative) পর্যন্ত হতে পারে। এ দৃষ্টিভঙ্গি আবার প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতামূলকও হতে পারে। ক্যারিয়ার গঠনে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির পাশাপাশি প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতামূলক মনোভাবও গঠন করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কোনটি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির উদাহরণ?
- ক) ক্ষুধার্তকে খাদ্য দেয়া
- খ) ক্ষুধার্তকে তিরস্কার করা
- গ) চুপচাপ থাকা
- ঘ) অন্যের সাহায্য না নেওয়ার উপদেশ দেয়া

২। কোনটি সহযোগিতামূলক মনোভাবের উদাহরণ?
- ক) খেলায় জেতার সম্ভাবনায় উৎসব করা
- খ) প্রতি পক্ষের খেলোয়াড়ের বিপদে খুশি হওয়া
- গ) কর্ণপাত না করে চুপচাপ থাকা
- ঘ) প্রতি পক্ষের খেলোয়াড় বিপদে পড়লে পাশে দাঁড়ানো

৩। ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনের ক্ষেত্রে কোনটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ?
- ক. শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা
- খ. ইতিহাস ও ঐতিহ্য
- গ. সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ
- ঘ. পরিবেশ ও শিক্ষা

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বলতে কী বুঝায় ? একটি উদাহরণের সাহায্যে আলোচনা করুন।
২. প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব কী ? চাকুরী ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব গঠনের ৫টি সুবিধা লিখুন।
৩. সহযোগিতামুলক মনোভাব ও সহযোগিতামূলক আচরণের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করুন। কীভাবে আমরা অন্যদের সহযোগিতার হাত বৃদ্ধি করতে পারি?
৪. "দৃষ্টিভঙ্গি ধনাত্মক হলে ক্যারিয়ারে সাফল্য আসে"- উক্তিটি বিশ্লেষণ করুন।
৫. " প্রতিযোগিতা ব্যতীত ক্যারিয়ার জগতে টেকা সম্ভব নয়"- উক্তিটির যথার্থতা বিচার করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.১ : ১. ক ২. ঘ ৩. ক

পাঠ-২.২ আত্মসচেতনতা ও আত্মবিশ্বাস : গুরত্ব ও উন্নয়ন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- আত্মসচেতনতার ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- আত্মসচেতনতা ও আত্মবিশ্বাসের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারবেন;
- আত্মসচেতন ও আত্মবিশ্বাসী হওয়ার গুরুত্ব কতটুকু আলোচনা করতে পারবেন;
- আত্মসচেতন ও আত্মবিশ্বাসী হওয়ার উপায় বর্ণনা করতে পারবেন;
- ক্যারিয়ার গঠনে আত্বসচেতনতা ও আত্মবিশ্বাসের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ক্যারিয়ার গঠনে আত্মসচেতনতা ও আত্মবিশ্বাসের ভূমিকা অনস্বীকার্য। আত্মসচেতনতা এমন একটি গুণ যা দ্বারা মানুষ নিজের প্রতি দায়িত্বশীল আচরণ করে। আর আত্মবিশ্বাস ব্যক্তির এ আচরণ সংঘটনে প্রেরণা যোগায়। আত্মসচেতনতা ও আত্মবিশ্বাস ছাড়া কোন কাজেই সফল হওয়া যায় না। ক্যারিয়ার গঠনে নিজেকে যেমন আত্মসচেতনতার পরিচয় দিতে হবে; তেমনি নিজের প্রতি গভীর বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে।

কাজ: শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আসুন আমরা নিচের ছকে নিজের ১০টি সবল দিক ও ১০টি দুর্বল দিক উল্লেখ করি:

সবল দিক	দুর্বল দিক
১.	১.
২.	২.
৩.	৩.
৪.	৪.
৫.	৫.
৬.	৬.
৭.	৭.
৮.	৮.
৯.	৯.
১০.	১০.

আত্মসচেতন হওয়ার গুরুত্ব

যে মানুষ নিজেই নিজের ভুলত্রুটির বিচার করতে সক্ষম সেই আত্মসচেতন মানুষ। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত দার্শনিক সক্রেটিস বলেছেন - Know thyself –"নিজেকে জানো"। নিজেকে জানার অর্থ হলো নিজের গুণাবলি ও ত্রুটিপূর্ণ দিকসমূহ জানা এবং ত্রুটিসমূহ দূরীকরণের উপায়সমূহ জানা এবং নিজের উন্নয়নে সার্বক্ষণিকভাবে কাজ করে যাওয়াকে বুঝায়। শুধু নিজের ভাল-মন্দ দিক জানলেই চলবে না, অন্যের ভাল-মন্দ বিবেচনায় রাখাও আত্মসচেতনতা। নারী জাগরণের অগ্রদূত মহীয়সী নারী বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ছিলেন নারীদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন এবং নিজের বিবেক-বুদ্ধি বিচার সম্পন্ন একজন আত্মসচেতন নারী। জগতের সকল সফল ব্যক্তিগণ ছিলেন আত্মসচেতন। এখানে একটা কথা বলে রাখা অনস্বীকার্য যে, যারা আত্মসচেতন, তারাই আত্মবিশ্বাসী ও আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন। তাদের মাধ্যমে সমাজে ক্ষতি হবার কোন সম্ভাবনা নেই। তাই আত্মসচেতন থাকার গুরুত্ব অপরিসীম। আত্মসচেতন ব্যক্তি তাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন, তারা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং ভবিষ্যত সম্পর্কে অনুমান করতে পারেন। ফলে তারা পূর্ব প্রস্তুতি নেওয়ার সুযোগ পান। আত্মসচেতন ব্যক্তিগণ যে কোন পরিবেশে পরিস্থিতি বুঝে ধীরে সুস্থে মোকাবেলা করতে পারেন। এখানে একটা উদারহণের অবতারণা করা যেতে পারে, সেটা হলো "ধূমপান" বিষয়ক। একজন ধূমপায়ী কখনও স্বার্থক উপায়ে

আত্মসচেতন হতে পারেন না। একজন অসাধু ব্যবসায়ী কখনও ওজনের ও বস্তুর গুণগত মান নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে সচেতন নয়। তবে আদর্শ শিক্ষক তার ছাত্রের পাঠদানের বিষয়ে সচেতন। একজন আদর্শ ডাক্তার তার রোগী ও চিকিৎসার বিষয়ে সচেতন। একজন আদর্শ "মা" তার সন্তানের সকল বিষয়ে সচেতন এবং নিজের বিষয়ে সচেতন। সুতরাং আত্মসচেতন হওয়া ব্যক্তি, সমাজ ও জাতীয় জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আত্মসচেতন হওয়ার উপায়

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এবার আসুন আমরা নিচের ছক দু'টি পূরণ করি:

নাম --------------শ্রেণি---------রোল-------শিক্ষার্থী

ক্রমিক নং	বিবরণ	অতিউত্তম	ভালো	অগ্রগতি ভালো	উত্তম	মোট
১						
২						
৩						
৪						
৫						
৬						
৭						
৮						
৯						
১০						
মোট						

এবার নিচের ছকটি লক্ষ করি এবং নিজের সচেতনতার বিষয়টি মিলাই:

নম্বর সীমা	ধারাবাহিকভাবে সচেতন করা গ্রেড
২৬-৩০	অতি উত্তম
২১-২৫	উত্তম
১৬-২০	ভালো
১০-১৫	অগ্রগতি প্রয়োজন ও সচেতন হওয়া প্রয়োজন

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, অতি উত্তমের জন্য ৩, ভালোর জন্য ২, এবং অগ্রগতি প্রয়োজন ১ নম্বর দিতে পারেন। ১০টি আইটেমের জন্য সর্বোচ্চ ৩০ এবং সর্বনিম্ন ১০ পেতে পারেন। উপরিউক্ত নম্বর সীমার জন্য নিচের গ্রেড প্রাপ্ত হলে, আপনি কোন গ্রেড পেলেন ? হিসাব করে বের করুন।

তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আপনাকে আরও আত্মসচেতন হওয়ার জন্য আর কী কী করণীয় তা নিচের ছকে লিপিবদ্ধ করুন।

ক্ষেত্রসমুহ	করণীয়সমুহ
১.	১.
২.	২.

ক্ষেত্রসমুহ	করণীয়সমুহ
৩.	৩.
৪.	৪.
৫.	৫.
৬.	৬.
৭.	৭.
৮.	৮.
৯.	৯.
১০.	১০.

দলগত কাজ-১:

বন্ধুরা, অদুর ভবিষ্যতে আপনারা প্রত্যেকেই কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করবেন। কর্মক্ষেত্রে সফলতা অর্জনের জন্য বা নিজের সুনাম বৃদ্ধির জন্য আপনাদের করণীয় কী হবে- দলগত আলোচনা করে নির্ধারণ করুন।

কাজ-২:

আত্মসচেতন হওয়ার ক্ষেত্রে সমসাময়িক ঘটনাবলি বা বিষয়াবলির দ্বারা আপনি কীভাবে প্রভাবিত হতে পারেন- দলগতভাবে আলোচনা করে উপস্থাপন করুন ?

ক্যারিয়ার গঠনে আত্মসচেতনার ভূমিকা

আত্মসচেতনতা একটি বড় গুণ। এই গুণের বলে মানুষ অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করতে পারে। ব্যক্তি তার লক্ষ্যের শীর্ষে পৌঁছার অবিরত প্রচেষ্টা চালায়। আর এ লক্ষ্যে পৌঁছার সিঁড়ি হিসেবে কাজ করে আত্মসচেতনতা। আত্মসচেতন ব্যক্তি সময়ের অপচয় করেন না। সময়কে মহা মূল্যবান মনে করেন জীবনের সমস্ত কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন করে থাকেন এবং ক্যারিয়ারে প্রবেশের পূর্বে পূর্ব প্রস্তুতি নিয়ে থাকেন। এবার একটি দৃষ্টান্ত আপনাদের সামনে উপস্থাপন করা হলো। মনে করুন, ২০১৫ সালে প্রায় একই সাথে আপনার দু'টি চাকরি হয়েছে। একটি হলো প্রশাসন ক্যাডারে এবং অন্যটি হলো শিক্ষা ক্যাডারে। এবার আপনি কোনটিতে যোগদান করবেন এবং কেন করবেন-স্বপক্ষে যুক্তি দিন।

নিচের ছকে আপনার মতামত ব্যক্ত করুনঃ-

বিসিএস শিক্ষা	
বিসিএস প্রশাসন	

আত্মবিশ্বাস কী?

ইংরেজি Self-confidence - এর বাংলা অর্থ আত্মবিশ্বাস। অর্থাৎ নিজের প্রতি নিজের দৃঢ় ধারণাই হলো আত্মবিশ্বাস। নিজের প্রতি নিজের ধারণা যদি স্পষ্টতর হয় যে, এই কাজটি করতে সক্ষম হবো তাহলে তাকে আত্মপ্রত্যয়ী বলা হয়। মুসা ইব্রাহমি আত্মপ্রত্যয়ী বা আত্মবিশ্বাসী হওয়ার জন্যই হিমালয়ের মতো উঁচু পর্বতারোহী হিসাবে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন।

আত্মবিশ্বাসী হওয়ার গুরুত্ব

আত্মবিশ্বাসী মানুষ আত্মবলীয়ান হয়। তাদের মধ্যে যে কোন কাজের বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না বরং তারা ইতিবাচক মানুষ হন। তাদের যোগ্যতা সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাসের বলে তারা দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। আত্মবিশ্বাসীগণ সকলের আস্থা অর্জনে সক্ষম হন। উদাহরণ হিসাবে আমরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, মাহাথীর মোহাম্মদ এবং মহাত্মা গান্ধীজীর নাম উল্লেখ করতে পারি। আত্মবিশ্বাসের বলেই তারা দেশ ও জাতির জন্য বড় ধরনের অবদান রাখতে পেরেছেন। সকলের কাছে তাইতো তাঁরা উজ্জ্বল নক্ষত্র এবং অনুসরণীয় হয়ে চিরদিন বেঁচে থাকবেন। "পাছে লোকে কিছু বলে"- এমন বিশ্বাসপ্রবণ লোক সাধারণত সন্দেহ প্রবণ হয়, এদের আত্ম-বিশ্বাস কম। এমন লোক জীবনে সফলকাম হতে পারে না। তাই বলা যায় সফলতার জন্য আত্মবিশ্বাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কাজ-১

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এবার আসুন আমরা আত্মবিশ্বাস উন্নয়নের উপায়সমূহ জেনে নেই–

অর্জনের উপায়	কীভাবে অর্জন সম্ভব
ক) শিক্ষার মাধ্যমে	ঃ
খ) নিজেকে জানার মাধ্যমে	ঃ
গ) বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে	ঃ
ঘ) নিজ অভিজ্ঞতা ও সফলতার মাধ্যমে	ঃ
ঙ) ইতিবাচক মনোভাব পোষণের মাধ্যমে	ঃ
চ) আদর্শ সঙ্গী বাছাইয়ের মাধ্যমে	

আত্মবিশ্বাস উন্নয়নের উপায়সমূহ

সাফল্য নামের সুখ পাখিটাকে ধরতে গেলে আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর কোন বিকল্প নেই। শুধু ধৈর্য আর শ্রমের মাধ্যমে জীবনে অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হয় না। এর জন্য দরকার হয় নিজের আত্মবিশ্বাস। আবার অনেক সময় কেবল নিজের আত্মবিশ্বাসের জোরেই অনেক কাজে সফল হওয়া যায়। অন্যথায় জীবন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কাজেই ধৈয্য ও শ্রমের পাশাপাশি নিজের আত্মবিশ্বাসও সাফল্য অর্জনের ক্ষেত্রে সমান গুরুত্বপূর্ণ।

নিম্নে আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর দশ উপায় উল্লেখ করা হলো-

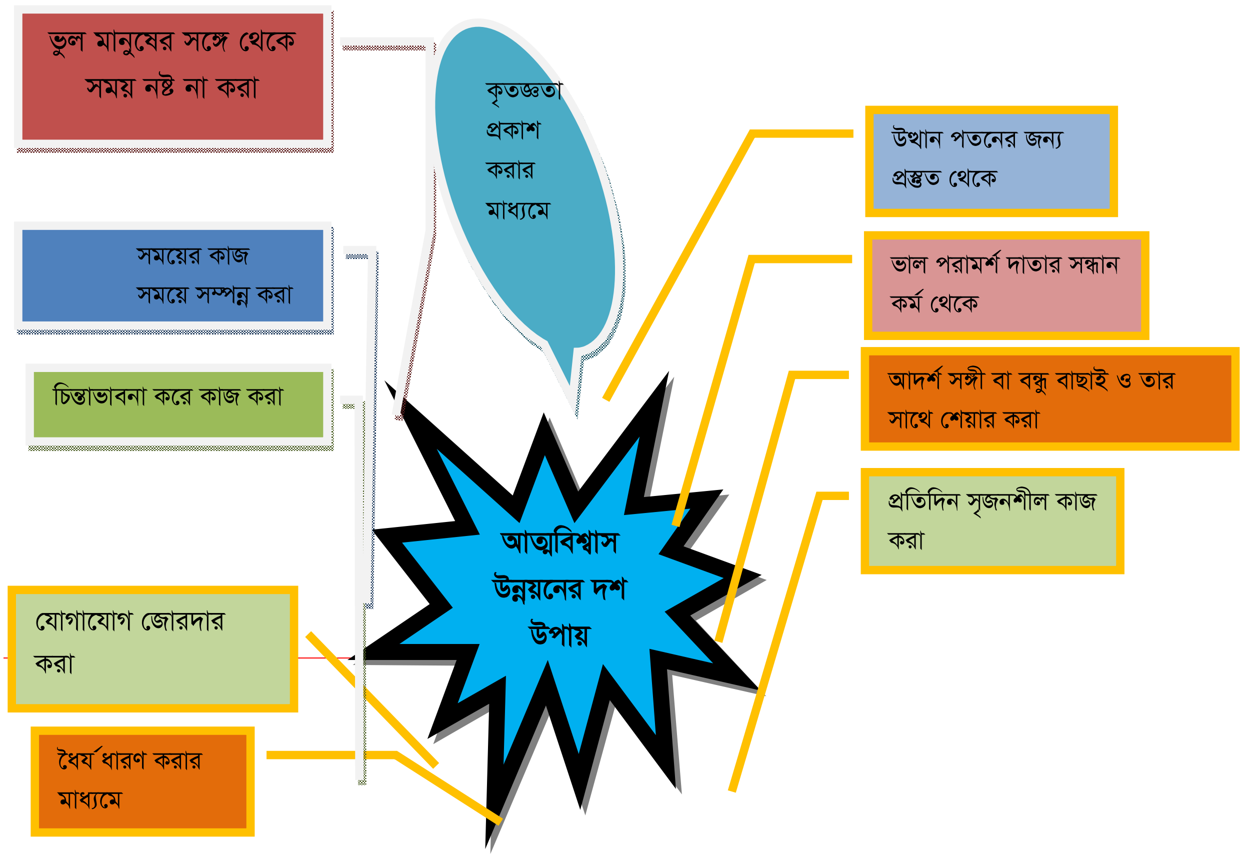

ক্যারিয়ার গঠনে আত্মবিশ্বাসের ভূমিকা কী হবে ?

ক্যারিয়ার গঠনে আত্মবিশ্বাসের প্রভাব বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। কোন কাজ করতে গিয়ে ভুল হলে সেই ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে নিজের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করা যায়। কেন ভুলটি হলো তার কারণ অনুসন্ধান করে চিহ্নিত করা যায়, যার ফলে পরবর্তীতে একই ভুলের পুনরাবৃত্তি ঘটে না। তাছাড়া লক্ষ্যমুখী প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। আমরা যে কাজই করি না কেন তার কিন্তু একটা অভিষ্ট লক্ষ্য থাকে। সুতরাং আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, আমরা আমাদের অভিষ্ট লক্ষ্যে না পৌঁছা পর্যন্ত অবিরত প্রচেষ্টা বা চর্চা বা অনুশীলন চালিয়ে যাব। আমি এ কাজ পারবো কিনা বা আমার দ্বারা এ কাজ হবে কিনা এমন হীনমন্যতাবোধ কাজে সফলতার পথে খুবই অন্তরায় বা বাধা স্বরূপ। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমার বিশ্বাস আপনারা এ পাঠ শেষে নিজেরা অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠবেন। জানেন, যারা আত্মবিশ্বাসী তারা হীনমন্যতাকে সহজে দূরে ঠেলে দিতে পারেন। সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সন্দেহ সংশয় বা হীনমন্যতা বাধা স্বরূপ। সুতরাং জীবনে যে কোন পর্যায়ে আত্মবিশ্বাসের সাথে সঠিক সিদ্ধান্ত নিলে আপনারা জয়ী হবেন। পিছুটান যাতে আপনাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে নেতিবাচক ভূমিকা না রাখতে পারে সেদিকেও সর্বদা সচেতন থাকবেন। মনে রাখবেন, যারা আত্মবিশ্বাসী তারা লক্ষ্য নির্ধারণে সবসময় অগ্রগামী থাকেন। ভয় ভীতিকে উপেক্ষা করে দৃঢ় মনোবলের সাথে তারা লক্ষ্য বাস্তবায়নে সচেষ্ট থাকেন।

সারসংক্ষেপ

আত্মসচেতনতা হলো নিজের শারিরীক ও মানসিক সফলতা ও দুর্বলতা বিষয়ে সচেতনতা। অর্থাৎ নিজের ভালো-মন্দ সম্পর্কে জানা ও চর্চা করা। নিজের অধিকার, নিজের দায়িত্ব-কর্তব্য, গুণাবলি ও ত্রুটিসমূহ প্রভৃতি বিষয়ে সুস্পষ্ট ও সঠিক চেতনা সৃষ্টির সামর্থ্য। আর নিজের প্রতি নিজের দৃঢ় ধারণাই হলো আত্মবিশ্বাস। আমি যা করছি বা বলছি, যা ভাবছি তা কী বুঝে শুনে ধীরে সুস্থে করছি বা বলছি। কাজটি করার ফলে আমার কী লাভ হবে। অন্যের কী লাভ হবে। অন্য কেউ

ক্ষতিগ্রস্থ হবে কিনা ইত্যাদি বিষয়ে সঠিক উপলব্ধি হলো আত্মসচেতনতা। ক্যারিয়ার গঠনে প্রত্যেককে যেমন আত্মসচেতন হতে হবে, তেমনি গভীর আত্মবিশ্বাসও রাখতে হবে। ব্যক্তি, সমাজ ও জাতীয় জীবনের উন্নয়নে আত্মসচেতনতা ও আত্মবিশ্বাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। Know thyself উক্তিটি কার?

ক) সক্রেটিস খ) প্লেটো
গ) রুশো ঘ) এরিস্টটল

২। আত্মসচেতনতা বলতে কী বোঝায়?

ক) নিজের স্বার্থ হাসিলে ব্যস্ত থাকা খ) নিজের ক্ষতি করে অন্যের উপকার করা
গ) নিজের ভালোমন্দ জানা ও চর্চা করা ঘ) সর্বদা নিজেকে উঁচু শ্রেণীর ভাবা

৩। আত্মবিশ্বাস কী?

ক) অন্যের শক্তিতে বলিয়ান হওয়া খ) নিজের প্রতি নিজের ধারণা দৃঢ় থাকা
গ) নিজের প্রতি নেতিবাচক ধারণা থাকা ঘ) সর্বদা হতাশাগ্রস্থ থাকা

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

রচনামূলক প্রশ্ন

১. আত্মসচেতনার ধারণাটি ব্যাখ্যা করুন।
২. আত্মসচেতনতা ও আত্মবিশ্বাসের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করুন।
৩. আত্মসচেতনতা ও আত্মবিশ্বাসী হওয়ার প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর করুন।
৪. ব্যক্তি জীবনে আত্মসচেতন হওয়ার উপায়সমূহ কী।
৫. পেশাগত জীবনে কী কী উপায়ে আত্মবিশ্বাসী হওয়া যায় তা উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।
৬. ক্যারিয়ার গঠনে আত্মসচেতন ও আত্মবিশ্বাসের প্রভাব পর্যালোচনা করুন।
৭. আত্মসচেতন হওয়ার ক্ষেত্রে আপনার পরিবার ও বিদ্যালয়ের ভূমিকা আলোকপাত করুন।
৮. আপনি কি মনে করেন, ব্যক্তির আত্মবিশ্বাসের উন্নয়ন করা সম্ভব। আপনার উত্তরের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করুন।
৯. নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং প্রশ্নের উত্তর দিনঃ

মনে করুন, আপনি মাহমুদ হাসান চাকুরি জীবনে একজন সফল মানুষ। কারণ আপনার ছিল অগাধ আত্মবিশ্বাস। আপনি ছিলেন সর্বদা সচেতন। তাই দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলে আপনার ক্যারিয়ার সম্পর্কে মানুষকে সফলতার গল্প শোনান।

(ক) ক্যারিয়ার কী? ১
(খ) চাকুরী জীবনে সফল হওয়ার ৪টি প্রধান গুণ বর্ণনা করুন। ২
(গ) আপনি কীভাবে অগাধ আত্মবিশ্বাসের মাধ্যমে সফলতার শীর্ষে পৌছালেন তা ব্যাখ্যা করুন। ৩
(ঘ) ‘‘ আত্মবিশ্বাস ও আত্মসচেতনতা মানেই সফলতা’’ উক্তিটি বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.২ : ১. ক ২. গ ৩. খ

পাঠ-২.৩ দৃঢ় প্রত্যয় : গুরুত্ব ও কৌশল

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- দৃঢ় প্রত্যয়ের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ক্যারিয়ার গঠনে দৃঢ় প্রত্যয়ী হওয়ার গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন;
- দৃঢ় প্রত্যয়ী হওয়ার কৌশলসমূহ উল্লেখ পূর্বক বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

ক্যারিয়ার গঠনে প্রয়োজন লক্ষ্য অনুযায়ী ব্যক্তির অবিরত প্রচেষ্টা। এজন্য ব্যক্তিকে দৃঢ় প্রত্যয়ী হওয়া দরকার। দৃঢ় প্রত্যয় না হলে লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হয় না। এই পাঠে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্তির ক্যারিয়ার গঠনে কীভাবে সহায়তা করে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

ক. দৃঢ় প্রত্যয়ের ধারণা

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আপনারা কী দু' একজন দৃঢ় প্রত্যয়ী ব্যক্তির নাম বলতে পারবেন, যার কথা ও কাজের মধ্যে মিল ছিল। তাহলে দৃঢ় প্রত্যয়ী কী ? ব্যক্তির মধ্যে কোন কোন বৈশিষ্ট্য থাকলে তাকে দৃঢ় প্রত্যয়ী ব্যক্তি বলা যাবে? এমন অন্তত ৬টি বৈশিষ্ট্যের কথা নিচের ছকে উল্লেখ করুন।

উদাহরণ হিসেবে আপনাদের জন্য একটি প্রদত্ত হলো:

১. তিনি যুক্তি সংগত কথা বলেন এবং নিজের মতে অটল থাকেন।	৪.
২.	৫.
৩.	৬.

এবার আপনাদের দেয়া বৈশিষ্ট্যের আলোকে নিজেরা দলগতভাবে দৃঢ় প্রত্যয়ের একটি সংজ্ঞা তৈরি করুন।

দৃঢ় প্রত্যয় হলো---

---।

খ.ক্যারিয়ার গঠনে দৃঢ় প্রত্যয়ী হওয়ার গুরুত্ব

প্রতিটি মানুষের জীবনে তার কথার সাথে কাজের মিল থাকা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। যে মানুষের কথার সাথে কাজের মিল পাওয়া যায় না তাদেরকে মানুষ পছন্দ করে না। যারা কাজের প্রতি দৃঢ় প্রতিশ্রুতিব্ধ তারা জীবনে সফল হবে। ব্যক্তিগত জীবনে যারা দৃঢ় প্রত্যয়ী তারা সব সময় তাদের স্বপ্ন পুরণ করে থাকেন। উদাহরণ হিসেবে আমরা ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা ড. ফজলে হাসান আবেদকে দৃঢ় প্রত্যয়ী মনোভাবের দৃষ্টান্ত হিসাবে আনতে পারি। এতে দৃঢ় প্রত্যয়ের ধারণা ও গুরুত্ব আপনারা আরো ভালভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন। ব্যক্তি যখন তার লক্ষ্য স্থির করে বা সুনির্দিষ্ট করে এবং উক্ত লক্ষ্যের ভালো মন্দ জেনে সচেতনভাবে তীব্র বাসনা নিয়ে নিজে নিজে এগিয়ে যায় তখন তাকে কেউ দাবিয়ে রাখতে পারে না। ফলে ব্যক্তির সফলতা অনিবার্য হয়ে পড়ে। অর্থাৎ সে সফল হয়।

গ. ক্যারিয়ার গঠনে দৃঢ় প্রত্যয়ী হওয়ার কৌশল

যারা জ্বী হুজুর টাইপ লোক তারা কখনই দৃঢ় প্রত্যয়ী নন। এখানে জ্বী হুজুর কথাটার অর্থ হলো তোষামোদকারী বা মোসাহেব। যারা নিজের অবস্থা ঠিক রাখতে পারেন না, তাদেরকে মানুষ ব্যক্তিত্বহীন বলে। ব্যক্তিত্বহীন বা তুলনামূলকভাবে কম ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোককে অধীনস্থরা বা সহকর্মীরা পছন্দ করে না। সে জন্য চাকুরীতে বা স্বপেশায় দৃঢ় প্রত্যয়ী হতে হয়। আত্মপ্রত্যয়ী মানুষ শ্রদ্ধাবান হন। কর্তৃপক্ষ, সহকর্মীগণ তাদেরকে প্রতিষ্ঠানের সকল বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্ব দেন। দৃঢ় প্রত্যয় বংশগতভাবে প্রাপ্ত কোন গুণ নয়, এটি অর্জন করতে হয়। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তাহলে আসুন আমরা জোড়ায় চিন্তা করে দৃঢ় প্রত্যয়ী হওয়ার ৫টি কৌশল খুঁজে বের করি।

ঘ. দৃঢ় প্রত্যয়ী হওয়ার কৌশল কী কী হতে পারে, তা আলোচনা করে লিখুন।

১. ---
২. ---
৩. ---
৪. ---
৫. ---

সম্ভাব্য উত্তরঃ দৃঢ় প্রত্যয়ী হওয়ার কৌশল

১. ধীর স্থির চিন্তা করে কথা বলা ২. স্পষ্টভাবে নিজের মতামত জানানো ৩. অপরকে মনোযোগ সহকারে শোনা ও বোঝা ৫. কথা ও কাজের মধ্যে সঙ্গতি থাকা ৬. বিষয়টির পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করা ৭. অপরের অবদান কে শ্রদ্ধা ও স্বীকৃতি জানানো ৮. সহজ থাকা ও গভীরভাবে নিশ্বাস নেওয়া ৯. সততা ও দৃঢ়তা অর্জন করা ১০. কাজে সিরিয়াস হওয়া।

সারসংক্ষেপ

দৃঢ় প্রত্যয় হলো নিজের যুক্তিসংগত মত প্রতিষ্ঠায় অটল থাকতে পারা। জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভের ক্ষেত্রে দৃঢ়তার সাথে নিজের মতামতকে যুক্তিযুক্তভাবে প্রতিষ্ঠা করা এবং অন্যকে প্রভাবিত করার ক্ষমতাকে দৃঢ় প্রত্যয় বলে। দৃঢ় প্রত্যয় না থাকলে লক্ষ্যে উপনীত হওয়া কঠিন। অন্যদিকে দৃঢ় প্রত্যয়ীরা যে কোন উপায়ে শেষ পর্যন্ত লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হয়। তাই ক্যারিয়ার গঠনে প্রত্যেককে দৃঢ় প্রত্যয়ী হওয়া প্রয়োজন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। দৃঢ় প্রত্যয় কী?
- ক) দৃঢ় প্রত্যয় হলো নিজের যুক্তিসংগত মত প্রতিষ্ঠায় অটল থাকতে পারা
- খ) গায়ের জোরে নিজের মতামত অন্যের উপর চাপিয়ে দেয়া
- গ) নিজের যুক্তিসংগত মতামত প্রতিষ্ঠা না করে অন্যের মতামত মেনে নেওয়া
- ঘ) সিদ্ধান্তের ব্যাপারে নিজেকে নিরপেক্ষ রাখা

২। কোন ধরনের লোক সকলের শ্রদ্ধা পান?
- ক) পরনির্ভরশীল
- খ) দৃঢ় প্রত্যয়ী
- গ) তোষামোদকারী
- ঘ) আত্মভোলা

রচনামূলক প্রশ্ন

১. দৃঢ় প্রত্যয়ের ধারণা ব্যাখ্যা করুন।

২. দৃঢ় প্রত্যয়ের ৬টি সমার্থক শব্দ লিখুন।
৩. ক্যারিয়ার গঠনে দৃঢ় প্রত্যয়ী হওয়ার গুরুত্ব লিপিবদ্ধ করুন।
৪. দৃঢ় প্রত্যয়ী ব্যক্তির ৬টি গুণ উল্লেখ করুন।
৫. ক্যারিয়ার গঠনে দৃঢ় প্রত্যয়ী হয়ে উঠার ৬টি উপায় বর্ণনা করুন।
৬. মনে করুন, আপনার বন্ধু রুহীর কথা ও কাজের মধ্যে সর্বদা মিল পাওয়া যায় এবং সে সৎ সাহসীও বটে। তাকে কী দৃঢ় প্রত্যয়ী বন্ধু হিসাবে বিবেচনা করতে পারেন- আপনার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করুন ।
৭. ''আত্ম প্রত্যয়ী মানুষ সর্বদা শ্রদ্ধাবান হন'' - উক্তি ব্যাখ্যা করুন ।
৮. ব্র্যাক এর প্রতিষ্ঠাতা ফজলে হাসান আবেদ 'দৃঢ় প্রত্যয়ী মানুষ'-উক্তিটি বিশ্লেষণ করুন।
৯. আপনার নিজের মধ্যে আত্মপ্রত্যয়ী হওয়ার কী কী গুণ আছে বলে আপনি মনে করেন এবং সেগুলোর ব্যাখ্যা দিন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৩ : **১.** ক ২. খ

পাঠ-২.৪ শ্রদ্ধাবোধ, পারস্পরিকনির্ভরশীলতা ও আন্ত:সম্পর্ক

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- শ্রদ্ধাবোধ, পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও আন্ত:ব্যক্তিক সম্পর্ক বলতে কী বোঝায়- ব্যাখ্যা করতে পারবেন,
- ক্যারিয়ার গঠনে শ্রদ্ধাবোধ, পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও আন্ত:ব্যক্তিক সম্পর্ক এর ভূমিকা উল্লেখ করতে পারবেন।

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে মানুষ সুশৃঙ্খলভাবে বসবাস করে। কোন মানুষ একা চলতে পারে না। এখানে প্রতিনিয়ত মানুষ পারস্পরিক সহযোগিতা, শ্রদ্ধাবোধ, পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ইত্যাদির বিনিময় করে থাকে। এসব গুণাবলি মানুষকে যেমন সভ্য হয়ে সমাজে বসবাসের উপযোগী করে তোলে তেমনি ব্যক্তির ক্যারিয়ার গঠনের পথ প্রশস্ত করে। এই পাঠে শ্রদ্ধাবোধ, পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও আন্ত:ব্যক্তিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা হবে।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আসুন শ্রদ্ধা কী এবং শ্রদ্ধাবান কে তার ধারণা ব্যক্ত করি।

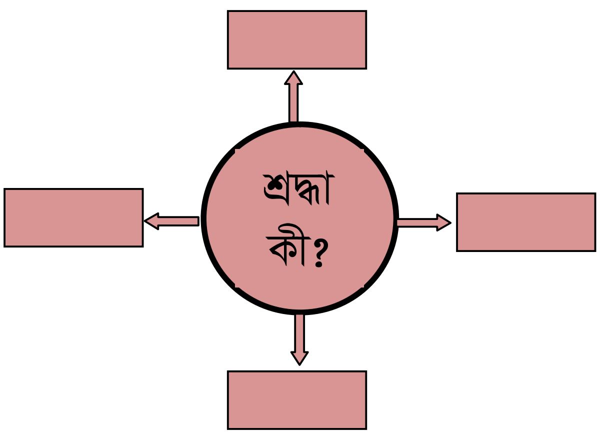

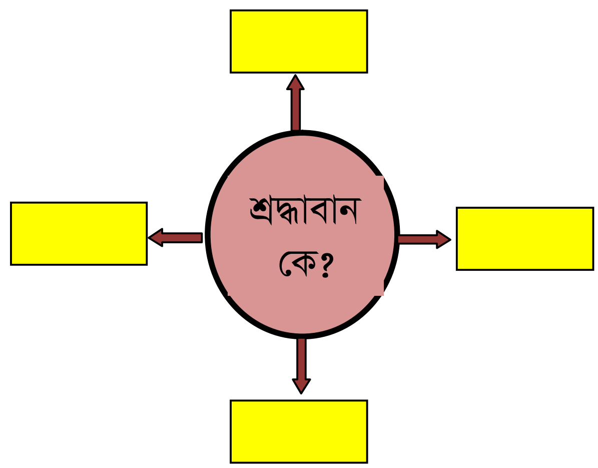

এবার বলুন, ঐসব ব্যক্তিগণ শ্রদ্ধাবান কেন ?

১. ---

২. ---

৩. ---

তাহলে এবার "শ্রদ্ধাবোধ " কী তা নিচের বক্সে লিখুন?

১.---

২.---

---.

শ্রদ্ধাবোধ, পারস্পরিক নির্ভরশিলতা ও আন্ত:ব্যক্তিক সম্পর্ক

শ্রদ্ধাবোধ কী?

শ্রদ্ধাবোধ একটি মানবিক গুণ। এটি মানুষকে অর্জন করতে হয়। সমাজের সব মানুষের প্রত্যাশিত ও গ্রহণযোগ্য একটি গুণ বৈশিষ্ট্যকে শ্রদ্ধাবোধ বলা হয়। শ্রদ্ধা একটি মূল্যবোধের মানদণ্ড। একটি সমাজে ছোটরা কীভাবে এবং কতটুকু সম্মান করে তা দিয়ে ঐ সমাজের মানদণ্ড নির্ণয় করা যায়। সমাজের প্রতিটি পেশার মানুষের সম্মান বা মর্যাদা রয়েছে। আবার বয়স অনুযায়ী এই মর্যাদাকে শ্রেণিবিভাজন করা হয়। যেমন- ছোটরা বড়দের ছালাম বা আদাব দেবে এবং বড়রাও ছোটদের স্নেহ, আদার, সোহাগ করবেন। এর মাধ্যমে সমাজে শ্রদ্ধাবোধ আচরণটির অনুশীলন চলবে। একজন শিক্ষার্থীর প্রকৃত মনুষ্যত্ববোধ জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি এই শ্রদ্ধাবোধ বিশেষ ভূমিকা রাখে।

পারস্পরিক নির্ভশীলতা কী?

পারস্পরিক নির্ভরশীলতা অর্থ হলো একে অন্যের প্রতি কোন না কোন ভাবে নির্ভর করা। কেউই একা একা চলতে পারে না। যেমন, রোগ হলে আমরা ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হই, আবার ডাক্তারের রোগী না থাকলে চলবে না, অনুরূপভাবে ডাক্তারদের শিক্ষার জন্য স্কুল কলেজে পড়াশুনা করতে হয়, স্কুল কলেজকে আবার বই পুস্তক সংগ্রহের জন্য প্রকাশকদের নিকট ধর্ণা দিতে হয়। এভাবে এটা একটি চেইনের মত কাজ করে। এই পারস্পারিক নির্ভরশীলতা চলতে থাকে। এছাড়াও বলা যায় আমরা যেমন ভাত খাওয়ার জন্য কৃষকের উপর, তেমনি কৃষক অর্থের জন্য আমাদের উপর নির্ভরশীল। এভাবে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার মাধ্যমে সমাজ আরও সুন্দর ও সৌহার্দময় এবং প্রীতিময় হয়ে ওঠে।

আন্ত:ব্যক্তিক সম্পর্ক কী?

সম্পর্ক বজায় রেখে অন্যের সাথে যোগাযোগ করাকে আন্ত:ব্যক্তিক সম্পর্ক বলা হয়। এটি একটি দক্ষতাও বটে। অর্থাৎ মানুষকে বুঝিয়ে কথা বলার দক্ষতাকে আন্ত:ব্যক্তিক সম্পর্কের দক্ষতা বলা হয়। অন্যকে ইতিবাচকভাবে ‘না’ বলাকেও আন্ত:ব্যক্তিক সম্পর্কের দক্ষতা বলা হয়। সমাজে বা কর্মক্ষেত্রে চলতে হলে সবার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে কাজ করতে হয়। সুতরাং মানুষের সাথে মানুষের যে পারস্পরিক সম্পর্ক ধরে রাখার কৌশল একেই আন্ত:ব্যক্তিক সম্পর্ক বলা হয়।

ক্যারিয়ার গঠনে শ্রদ্ধাবোধ, পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্কের ভূমিকা :

কর্মজীবনে সফলতার চাবিকাঠি হলো শ্রদ্ধাবোধ ও অন্যের প্রতি সহমর্মিতা দেখানো। বড়দের শ্রদ্ধা ও ছোটদের আদর স্নেহের মাধ্যমে অন্যের শ্রদ্ধার পাত্র হওয়া যায়। ক্যারিয়ার গঠনে এই শ্রদ্ধাবোধ বিষয়টি খুবই গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করে। উর্ধ্বতন ও অধীনস্থদের নিকট গ্রহণযোগ্য হওয়ার সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হচ্ছে অন্যের প্রতি বিনয়ী ও শ্রদ্ধাশীল হওয়া বা অন্যকে যথাযথভাবে মর্যাদা প্রদান করা। এর মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ আরও উন্নততর হয়। ভোক্তা আরও অধিকতর সেবা পায়।

কথায় আছে, একা যে, বোকা সে। অর্থাৎ এক জনের পক্ষে একটি কাজ করা কঠিন হলেও অনেকে মিলে মিশে সে কাজ একসাথে করলে তা সহজ হয়, কষ্ট লাঘব হয়। তাই এ ধরনের কাজ করতে অন্যের সহযোগিতার প্রয়োজন হয়। এটাই পারস্পরিক নির্ভরশীলতা। ধরুন, বিদ্যালয়ে বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান হবে। এ কাজটি সফল করা কারও একার পক্ষে সম্ভব নয়। এজন্য অনেকের সহযোগিতা প্রয়োজন, তাই নয় কী? যেমন, কেউ নিমন্ত্রণ পত্র বিতরণ করবে, কেউ খেলাধুলা পরিচালনা করবে, কেউ আবার অতিথি আপ্যায়ন করবে, কেউ পুরস্কার ক্রয় করবে ও বিতরণ করবে ইত্যাদি। সুতরাং ক্যারিয়ার গঠনে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার এই দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষভাবে ভূমিকা রাখতে পারে, যা ক্যারিয়ারের উন্নত শিখরে ব্যক্তিকে পৌঁছে দিতে সহায়তা করে।

এবার আসা যাক, আন্ত:ব্যক্তিক সম্পর্ক কীভাবে ক্যারিয়ার গঠনে ভূমিকা রাখে? ‘সম্পর্ক’ একটি বড় ধরনের বিনিয়োগ। বিনিয়োগ করে ব্যবসায়ীরা যেমন লাভবান হন তেমনি সমাজস্থ মানুষের সাথে সুসম্পর্কের কারণে ব্যক্তি তার জীবনের বড় ধরনের সমস্যা সহজে সমাধান করতে পারেন। কাজেই, পরিবার, সমাজ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্র ইত্যাদি ক্ষেত্রে আন্ত:ব্যক্তিক সম্পর্ক সমস্যা সমাধানে ও উন্নয়নে বিশেষভাবে ভূমিকা রাখে। ক্যারিয়ারকে বিকশিত করার জন্য আন্ত:ব্যক্তিক সম্পর্কের দক্ষতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে, সহপাঠি, বন্ধু, শিক্ষক সহকর্মী ও অন্যদের নিকট থেকে বিভিন্ন ধরনের দিকনির্দেশনাসহ অনেক সহযোগিতাও পাওয়া যায়।

দলগত কাজ-১ : কী কী উপায়ে আপনার সহপাঠীদের সাথে আন্ত:ব্যক্তিক সম্পর্ক উন্নয়ন করা যেতে পারে বলে আপনি মনে করেন।

সারসংক্ষেপ

সমাজে বসবাসের জন্য মানুষকে অপরিহার্য কতগুলো গুণ অর্জন করতে হয় যা ছাড়া সভ্য সমাজে টিকে থাকা যায় না। এগুলোর মধ্যে শ্রদ্ধাবোধ, পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও আন্ত:ব্যক্তিক সম্পর্ক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রদ্ধাবোধ, পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও আন্ত:ব্যক্তিক সম্পর্ক এই তিনটি গুণের মাধ্যমে যেমন সমাজে শৃঙ্খলা, পরস্পরিক সহযোগিতা ও ভারসাম্য বজায় থাকে তেমনি ব্যক্তি জীবনে ক্যারিয়ারের বিকাশ ঘটে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। শ্রদ্ধাবোধ কী? ’

ক) অন্যকে বড় মনে করা
খ) ব্যক্তিকে তার উপযুক্ত সম্মান দেয়া
গ) নিজের ক্ষতি করে অন্যের উপকার করা
ঘ) মোসাহেবী করা

২। পারস্পরিক নির্ভরশীলতা কী? ’

ক) অন্যের দায়িত্ব নিয়ে নিজে স্বনির্ভর হওয়া
খ) আপন স্বার্থে অন্যের সাহায্য গ্রহণ
গ) নিজে সব সময় পরনির্ভরশীল থাকা
ঘ) একে অন্যের উপর কোন না কোনভাবে নির্ভর থাকা

রচনামূলক প্রশ্ন

১. শ্রদ্ধাবান কে?
২. শ্রদ্ধাবোধের ধারণা ব্যাখ্যা করুন।
৩. শ্রদ্ধাবোধ কীভাবে অর্জন করা যায়?
৪. শ্রদ্ধাবান ব্যক্তির মধ্যে কী কী আর্দশ বিদ্যমান থাকে তা ব্যাখ্যা করুন।
৫. পরস্পরিক নির্ভরশীলতা বলতে কী বুঝায়?
৬. আন্তঃব্যক্তি সম্পর্ক বলতে কী বুঝায়? ব্যাখ্যা করুন।
৭. ক্যারিয়ার গঠনে শ্রদ্ধাবোধ, পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও আন্তঃব্যক্তিক দক্ষতা কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারে তা আলোচনা করুন।
৮. নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিনঃ

শ্রদ্ধা একটি সামাজিক গুণ। আমাদের সমাজের মূল্যবোধ হচ্ছে বড়দের কে শ্রদ্ধা এবং ছোটদের কে স্নেহ করা। ক্যারিয়ার গঠনে ও সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। সবার কাছে শ্রদ্ধাবান হওয়ার উপায় হচ্ছে সততা এবং ব্যক্তির অন্যদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার মনোভাব থাকা।

(ক) শ্রদ্ধাবোধ কী?
(খ) সততা ও শ্রদ্ধা কীভাবে একটি সামাজিক গুণ ব্যাখ্যা করুন।
(গ) বড়দের শ্রদ্ধা ও ছোটদের স্লেহ করার কারণ ব্যাখ্যা করুন।
(ঘ) আপনার চাকুরি জীবনে আপনি কীভাবে শ্রদ্ধাবান ও অন্যের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবেন তার উপায় বের করুন।

৯। নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিনঃ

জনাব মুহাম্মদ মুহসীন ঐতিহ্যবাহী হেমনগর শশী মুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের একজন নিবেদিত প্রাণ সফল শিক্ষক। তিনি ছাত্র শিক্ষক অভিভাবক সবার নিকট একজন সর্বজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্ব। তিনি সবার সাথে হাসিখুশি, বিনয়ের সাথে কথা বলেন। তিনি একজন প্রজ্ঞাবান সৎ মানুষ।

(ক) শ্রদ্ধাবান কে? ১
(খ) সবর্জন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি হওয়ার ৪টি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন। ২
(গ) জনাব মুহাম্মদ মহসীন কীভাবে একজন সফল শিক্ষক ও শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিত্ব হলেন- তা বিশ্লেষণ করুন। ৩
(ঘ) প্রবাদে আছে ‘‘শ্রদ্ধাবানে লভে জ্ঞান, অন্য কেহ নয়’’ - উক্তিটি বর্ণিত উদ্দীপকের আলোকে মূল্যায়ন করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৪ : ১। খ ২। ঘ

পাঠ-২.৫ আইনের প্রতি শ্রদ্ধা ও দেশপ্রেম

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবেন এবং আইন মেনে চলার মনোভাব প্রদর্শন করতে পারবেন।
- দেশপ্রেম কী তা বলতে পারবেন।
- সত্যিকার দেশপ্রেমিকের গুণাবলি কী তা বলতে পারবেন।

আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া

দেশ ও সমাজকে সুন্দরভাবে পরিচালনা করার জন্য আইন প্রণয়ন করা হয়, যাতে সমাজে বা দেশে কোন বিশৃঙ্খলা দেখা না দেয়। একটি সমাজ, রাষ্ট্র ও শাসনব্যবস্থা টিকে থাকে তার আইন ও শাসন ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। যে সমাজে বা দেশে আইন যথাযথভাবে মানা হয় সেখানে শান্তি ও কল্যাণ বিদ্যমান থাকে। পক্ষান্তরে যে সমাজে বা দেশে আইন ভঙ্গ করা হয় সেখানে সৃষ্টি হয় অনাচার, নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা। সুতরাং আইন যথাযথভাবে বাস্তাবায়ন ও প্রয়োগের পূর্বশত হচ্ছে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া। আইনে যা করতে বলা হয়েছে তা যথাযথভাবে মানা আর করতে নিষেধ হয়েছে তা না করাই হচ্ছে আইনের প্রতি শ্রদ্ধা। একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি আপনাদের কাছে আরও সুস্পষ্টীকরণ করা যায়। যেমন আপনারা জানেন যে, শিশু বিবাহ একটি আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। যে বা যারা এই শিশু বিবাহের সঙ্গে জড়িত থাকবে তাদের প্রত্যেকের এক হাজার টাকা করে জরিমানা এবং একমাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড হবে।

আইনের এই শাস্তিমূলক ধারা জেনেও যারা স্কুল পড়ুয়া শিক্ষার্থীর শিশু বিবাহ দেবার ব্যবস্থা করবেন তারা মুলতঃ আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নহেন। উল্লেখ্য যে, এখানে শিশু বিবাহ বলতে ১৮ বছরের নিচের মেয়ে এবং ২১ বছরের নিচের ছেলের বিবাহকে ‘শিশু বিবাহ’ আইন বলা হয়েছে। কাজেই এইরকম আরও অনেক আইন আছে, সেগুলো জেনে তা যথাযথভাবে মানাই হচ্ছে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া।

আমাদের সকলেরই মনে রাখা উচিত যে, কেউই আইনের ঊর্ধ্বে নই। সবাইকেই আইন মেনে চলতে হয় এবং আইনের আওতাভুক্ত থাকতে হয়। তাই আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা সবার জন্যই বাধ্যতামূলক। তেমনি কর্মক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন বা কোম্পানীর নিজস্ব কিছু বিধিবিধান আছে যা অবশ্যই সংশ্লিষ্টদের মেনে চলতে হয়।
সুতরাং আপনাদের উচিত শিক্ষা জীবন থেকেই বিদ্যালয় তথা পরিবার বা দেশের আইন কানুনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া। তাহলে আপনারা আপনাদের ক্যারিয়ার আরও সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে পারবেন।

দেশপ্রেম

আমরা সবাই ‘মা’ কে খুব ভালবাসি তাই নয় কী? নিশ্চয়ই আপনারাও ‘মা’ কে খুব পছন্দ করেন। মা কে ভালবাসা আর মাটিকে ভালবাসা একই কথা। ‘মা ও মাটি’ আমাদের সবচেয়ে আপন। ‘মা’ যেমন আমাদের পরিচয় (Identity) তেমনি দেশও আমাদের একমাত্র পরিচয়। আমরা বাংলাদেশের নাগরিক। ১৯৭১ সালে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে এদেশ স্বাধীন হয়েছে। আমরা বিশ্বের মানচিত্রে একটি নুতন দেশ ও একটি নতুন পতাকা পেয়েছি। এ দেশ একান্ত আমাদের, আমরাও এদেশের। তাই দেশকে গভীরভাবে অনুভব করা ও দেশের জন্য ভাল কিছু করা এবং দেশের জন্য প্রয়োজনে জীবন উৎসর্গ করাই হচ্ছে দেশপ্রেম। মায়ের প্রতি আমরা দায়িত্বশীল, তেমনি দেশের প্রতি প্রতিটি নাগরিকের দায়িত্বশীল হওয়াই হচ্ছে দেশপ্রেম।

৩. দেশ প্রেমিকের গুণাবলি

- নেতৃত্ব দানের ক্ষমতা অর্জন
- নতুন কিছু সৃষ্টির করার দক্ষতা
- নিজ নিজ পেশায় সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন
- সমস্যা সমাধান দক্ষতা

- সবার আগে দেশকে প্রাধান্য দেয়া
- ব্যক্তির চেয়ে দল এবং দলের চেয়ে দেশকে বড় ভাবা
- নাগরিকের দায়িত্ববোধ ও সামাজিক দক্ষতা থাকা
- দেশের উন্নয়ন ভাবনা ও দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া
- দেশের গোপন তথ্য, অন্য দেশে প্রচার না করা
- দেশের সুনাম নষ্ট হয় এমন কাজ না করা
- দেশের জন্য সদা প্রস্তুত থাকা
- দেশ ও দেশের মানুষকে ভালবাসা
- দেশের উন্নয়নের জন্য গবেষণা পরিচালনা এবং জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন
- সমৃদ্ধ দেশ গড়ার প্রত্যয়ে যোগ্যতা অর্জন করা।

সারসংক্ষেপ

দেশ ও সমাজকে সুন্দরভাবে পরিচালনা করার জন্য যে বিধি-বিধান প্রণয়ন করা হয় তাই আইন। সমাজ ও রাষ্ট্র সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনার জন্য আইন প্রণয়ন এবং তা প্রয়োগের বিকল্প নাই। আমাদের সকলেরই মনে রাখা উচিত যে, কেউই আইনের উর্ধ্বে নই। সবাইকেই আইন মেনে চলতে হয়। তাই আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা সবার জন্যই বাধ্যতামূলক। তেমনি কর্মক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন বা কোম্পানীর নিজস্ব কিছু বিধিবিধান আছে যা অবশ্যই সংশ্লিষ্টদের মেনে চলতে হয়। পাশাপাশি স্বদেশকে মন প্রাণ দিয়ে ভালবাসা এবং দেশের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা সবার জন্য অপরিহার্য। দেশকে ভালবেসে, দেশ-দশের সেবার মানসে আপন ক্যারিয়ারের বিকাশ ঘটানোর মানসিকতা সবারই থাকা উচিত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। আইনে যা যা করার স্বীকৃতি এবং যা যা করতে নিষেধ আছে তা মান্য করাকে কি বলা হয়?
ক) আইনের প্রতি শ্রদ্ধা
খ) সুনাগরিকতা
গ) দেশপ্রেম
ঘ) আইনের শাসন

২। দেশপ্রেম বলতে কী বোঝায়?
ক) দেশের সুবিধা ভোগ করা
খ) বিদেশে না গিয়ে দেশে চাকরি করা
গ) দেশ পরিচালনায় অংশগ্রহণ করা
ঘ) দেশকে গভীরভাবে অনুভব করা ও দেশের স্বার্থে কাজ করা

৩। দেশপ্রেমিকের গুণ কোনটি?
ক) আপন স্বার্থে ব্যস্ত থাকা
খ) নিজের যশখ্যাতি নিয়ে অর্জন করা
গ) দেশ ও দেশের মানুষকে ভালবাসা
ঘ) দেশের সুবিধা ভোগ করে নিজে বড় হওয়া

রচনামূলক প্রশ্ন

১. আইনের প্রতি কেন শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত?
২. দেশপ্রেম বলতে কী বুঝায়- ব্যাখ্যা করুন।
৩. একজন আর্দশ দেশ প্রেমিকের ১০টি যোগ্যতা ও গুণ বর্ণনা করুন।
৪. আপনি বড় হয়ে দেশের জন্য কী করবেন এবং তা কীভাবে করবেন- আলোচনা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৫ : ১। ক ২। ঘ ৩। গ

পাঠ-২.৬ নাগরিকতা ও সুনাগরিকের গুণাবলি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি−

- নাগরিক ও নাগরিকতা বলতে কী বোঝায় তা বলতে পারবেন;
- নাগরিকতা লাভের পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন;
- নাগরিকতার বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন;
- সুনাগরিকের গুণাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে কোন ব্যক্তির পদমর্যাদাই নাগরিকতা। নাগরিকতা জন্মসূত্র ও অনুমোদসূত্র উভয়ভাবে অর্জন করা যায়। নাগরিকতা যেভাবেই অর্জিত হোক না কেন সুনাগরিকগণ রাষ্ট্রের সম্পদ। সুনাগরিকগণ রাষ্ট্রের অধিকার ভোগের পাশাপাশি রাষ্ট্রের প্রতি যথাযথভাবে তার কর্তব্য পালন করেন। সেজন্য সুনাগরিকের অধিকার ও কর্তব্যগুলো সবারই জানা থাকা প্রয়োজন। এই পাঠে নাগরিক ও নাগরিকতা, নাগরিকতা লাভের পদ্ধতি এবং সুনাগরিকের গুণাবলি আলোচনা করা হবে।

পাঠ-ক: নাগরিক ও নাগরিকতার ধারণা সংজ্ঞায়িতকরণ

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আপনারা আপনাদের নিজের নোট খাতায় ছকটি লিখে চিন্তা করতে থাকুন।

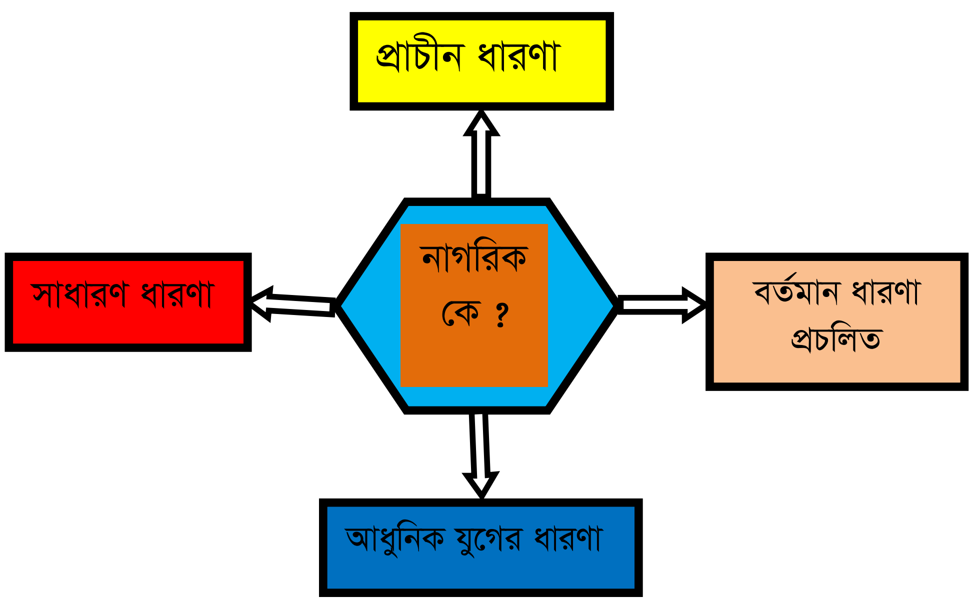

এবার রাষ্ট্রের কাছ থেকে আপনি কী কী সুবিধা ভোগ করেন তা গভীরভাবে চিন্তা করে নিচের ছকটি পূরণ করুন।

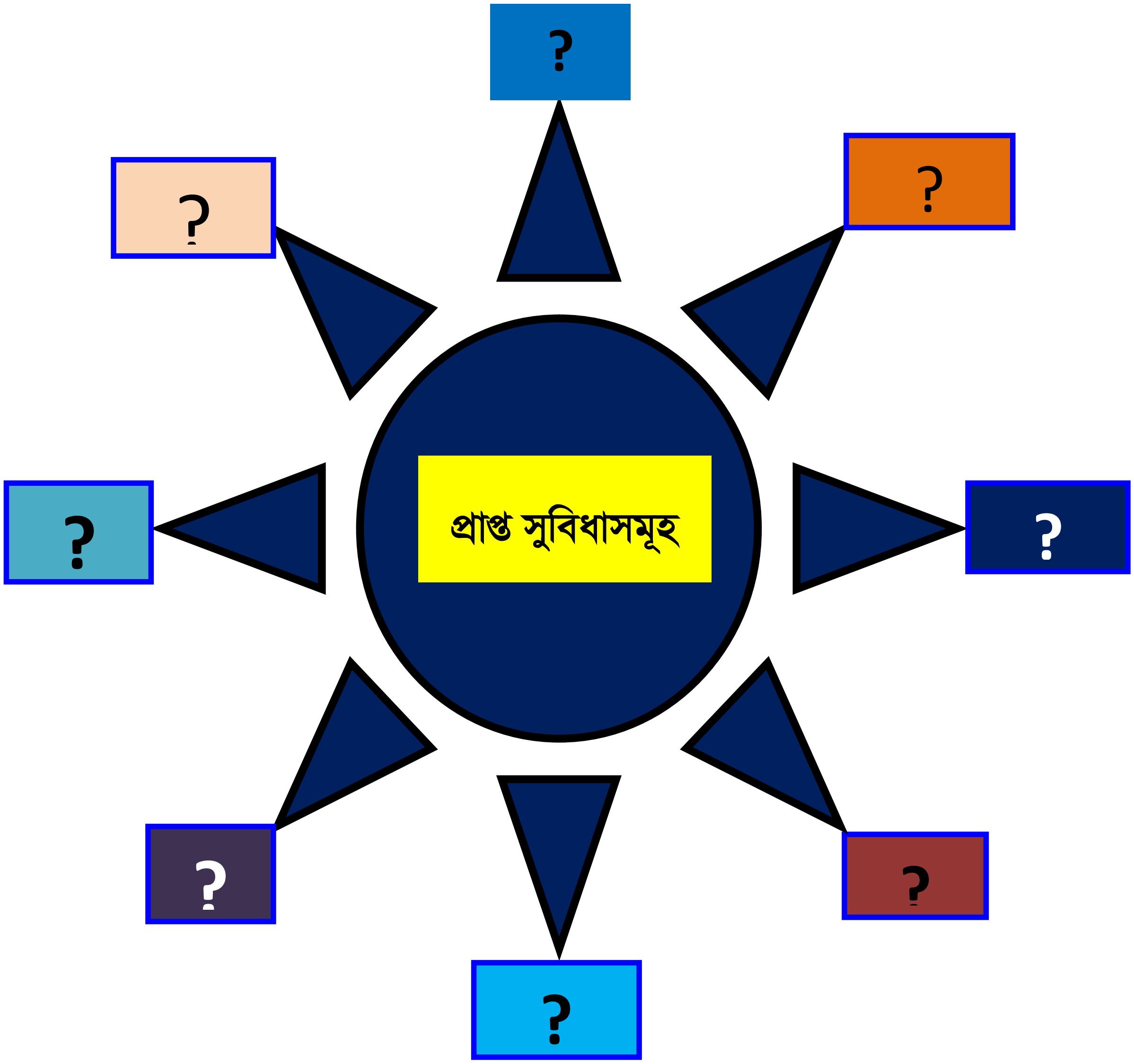

এবার আমরা রাষ্ট্রের প্রতি সাধারণত কী কী দায়িত্ব কর্তব্য পালন করি তা ভেবে চিন্তে নিচের ছকে লিখি ?

ক্রমিক নং	দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহের তালিকা
১.	
২.	
৩.	
৪.	
৫.	

উপরে প্রদত্ত তথ্য থেকে নাগরিক ও নাগরিকতার সংজ্ঞা তৈরি করে নিচের ছকে লিখুন।

নাগরিক	নাগরিকতা

নাগরিক ও নাগরিকতা

সাধারণ ভাবে নগরের অধিবাসীকে নাগরিক বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায় নগর রাষ্ট্রের শাসন কার্যে যারা অংগ্রহণ করত তাদেরকে নাগরিক বলা হয়। তবে রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে কোন ব্যক্তির পদ মর্যাদাই তার নাগরিকতা। নাগরিকতা নাগরিকের গুণাবলিকে বুঝায় যা ব্যক্তিকে অর্জন করতে হয়।

অধ্যাপক লাস্কির মতে, সার্বজনীন কল্যাণের জন্য ব্যক্তির বিচার বুদ্ধির সুষ্ঠু ব্যবহারের সুযোগই নাগরিকতা। কোন রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ সম্পদ রাষ্ট্রের বুদ্ধিমান নাগরিক।

নাগরিকতার বৈশিষ্ট্যগুলো হলো ঃ (১) রাষ্ট্রের সদস্য হওয়া (২) রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করা (৩) রাষ্ট্র থেকে সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করা (৪) রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা।

পর্ব খ– নাগরিকত্ব লাভের নিয়ম

নাগরিকত্ব হলো ব্যক্তির জাতীয় পরিচয়। এটি দুইভাবে লাভ করা যায়। যেমন-

১। জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব

২। অনুমোদনসূত্রে নাগরিকত্ব

ক)জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব লাভ

জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব লাভ ক্ষেত্রে দু'টি প্রধান বিবেচ্য বিষয় হলো:

১। জন্ম নীতি

২। জন্মস্থান নীতি

১। **জন্ম নীতি:** এই নীতি অনুযায়ী পিতা মাতার নাগরিকতা অনুযায়ী সন্তানের নাগরিকতা নির্ধারণ করা হয়। এ ক্ষেত্রে সন্তান যে দেশে বা স্থানেই ভূমিষ্ট হোক না কেন তার পিতা-মাতা যে দেশের নাগরিক সেও সে দেশের নাগরিক হবে। যেমন, বাংলাদেশী কোন দম্পতির সন্তান যদি জাপানে জন্মগ্রহণ করে তবে সেই সন্তান বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে বিবেচিত হবে। বাংলাদেশ, জাপান, ইতালী, ফ্রান্স প্রভৃতি রাষ্ট্র জন্ম নীতি মেনে চলে।

২। জন্মস্থান নীতি: এ নীতি অনুযায়ী পিতা মাতা যে দেশেরই নাগরিক হোক না কেন সন্তান যে রাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করবে সে সেই রাষ্ট্রের নাগরিক হবে। যেমন, বাংলাদেশী কোন দম্পতির সন্তান যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অথবা মার্কিন জাহাজ কিংবা দূতাবাসে ভূমিষ্ট হয় তবে সে সন্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক বলে গণ্য হবে। বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই নীতি অনুসরণ করে।

খ) অনুমোদসূত্রে নাগরিকত্ব লাভ

ব্যক্তির অনুমোদসূত্রে নাগরিকত্ব লাভের ক্ষেত্রে নিচের এক বা একাধিক শর্ত পূরণ করতে হয়। যথা:

১। রাষ্ট্রের কোনো নাগরিককে বিয়ে করতে হয়

২। ঐ রাষ্ট্রের সম্পত্তি ক্রয় করতে হয়

৩। ঐ রাষ্ট্রে সরকারি চাকরি করতে হয়

৪। ঐ দেশের ভাষা জানতে হয়

৫। ঐ রাষ্ট্রের সেনাবাহিনীতে চাকরি গ্রহণ করতে হয়।
৬। নির্দিষ্ট সময় বসবাস করতে হয়।

উপরোক্ত শর্তগুলোর মধ্যে এক বা একাধিক শর্ত পূরণ সাপেক্ষে নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে হয়। আবেদন মঞ্জুর হলে সে অনুমোদনসূত্রে নাগরিকে পরিণত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা প্রভৃতি রাষ্ট্রে অনুমোদনসূত্রে নাগরিকত্ব অর্জন সহজ।

তাছাড়া মানবিক কারণেও নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়। কোন ব্যক্তি যদি কোন রাষ্ট্রে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করে বা নিজ দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে কোন রাষ্ট্রে আশ্রয় নেয় তবে সে ব্যক্তি উক্ত রাষ্ট্রের কাছে নাগরিকত্বের আবেদন জানালে ঔ রাষ্ট্র তাকে অনুমোদনসূত্রে নাগরিকত্ব দিতে পারে।

নাগরিকের দায়িত্ব ও কতর্ব্য

নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্রের প্রতি আমাদের অনেক দায়িত্ব ও কতর্ব্য রয়েছে। যেমন:

রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকা: নাগরিক হিসেবে এটি আমাদের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। আমরা রাষ্ট্রের শাসন মেনে চলব। দেশের স্বার্থকে সবকিছুর ঊর্ধ্বে গুরুত্ব দিব।

আইন মেনে চলা: দেশের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য বিভিন্ন আইনকানুন আছে। এছাড়াও সরকার বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করে। এসব আইন মেনে চলা নাগরিক হিসেবে আমাদের কর্তব্য। কোনভাবেই এসব আইন আমরা অমান্য করব না। কারণ আমরা জানি যে, আইন অমান্য করলে শাস্তি ভোগ করতে হয়।

নিয়মিত কর প্রদান: রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য অনেক অর্থের প্রয়োজন। রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিচালনা এবং নাগরিকদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দেয়ার জন্য এ অর্থ প্রয়োজন হয়। নাগরিকদের দেয়া কর থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে সরকার এসব কাজ করে। তাই নিয়মিত কর দেয়া নাগরিকের কর্তব্য।

ভোটদান: আমাদের দেশের নাগরিকগণ ১৮ বছর হলে ভোট দিতে পারে। এর মাধ্যমে নাগরিকগণ রাষ্ট্রের শাসনকাজে অংশগ্রহণ করে। ভোট দেয়া সব নাগরিকের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমাদের সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিকে ভোট দেয়া উচিত।

রাষ্ট্রের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে সহায়তা করা: রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। নাগরিক হিসেবে আমাদের কর্তব্য হলো সরকারের এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহায়তা করা। এ জন্য আমাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করা।

শিক্ষা লাভ: দেশের উন্নয়নের জন্য শিক্ষিত নাগরিক অত্যন্ত প্রয়োজন। সন্তানদের শিক্ষিত করে গড়ে তোলা প্রত্যেক মা-বাবার দায়িত্ব ও কর্তব্য। আর মনোযোগের সাথে লেখাপড়া করে শিক্ষিত হওয়া আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।
এছাড়াও সুনাগরিক হিসাবে আমাদের আরো অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। যেমন-

- রাস্তায় চলার নিয়ম কানুন মেনে চলা উচিত।
- ওভার ব্রিজ দিয়ে রাস্তা পার হওয়া উচিত।
- রাস্তার মাঝখান দিয়ে না হেটে ফুটপাত দিয়ে হাঁটা দরকার।
- বাড়িতে/বাসায় সতর্কতার সাথে বিদ্যুৎ/ গ্যাস/ পানি অপচয় রোধ করা উচিত।
- বাড়ি/ রাস্তা/ বিদ্যালয়ে ও খেলার মাঠের নিয়ম কানুন যথাযথভাবে মেনে চলা উচিত।

পর্ব-০৩ঃ সুনাগরিকের গুণাবলি

সুনাগরিক বলতে সেই ব্যক্তিকে বোঝায় যিনি রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য চিন্তা করেন এবং প্রয়োজনীয় কর্তব্য পালন করেন। লর্ড ব্রাইস বলেন, "সেই ব্যক্তি সুনাগরিক যে বুদ্ধি, আত্মসংযম ও বিবেক এই তিনটি গুণের অধিকারী। সাধারণভাবে একজন সুনাগরিকের নিম্নরূপ গুণগুলো থাকা প্রয়োজন:

১. বিবেকবান হওয়া।
২. বুদ্ধিদীপ্ত ও সৎচরিত্রবান হওয়া।
৩. রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্বপরায়ণ থাকা।
৪. ভোটপ্রদান করে যোগ্যপ্রার্থী নির্বাচন করবেন।
৫. কর প্রদান করবেন।
৬. গণতন্ত্রমনা ও কল্যাণকামী হওয়া।
৭. সুদক্ষ হবেন।
৮. নৈতিক গুণাবলি সম্পন্ন হবেন।
৯. তিনি দেশের স্বার্থে কাজ করবেন।

সারসংক্ষেপ

সাধারণভাবে নগরের অধিবাসীকে নাগরিক বলা হয়। সুদুর অতীতে গ্রিসের নগর রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রের শাসন কার্যে যারা অংশগ্রহণ করত তাদেরকে নাগরিক বলা হতো। আধুনিককালে নাগরিক হচ্ছে সেই ব্যক্তি যিনি একটি রাষ্ট্রের স্থায়ী বাসিন্দা, রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত, রাষ্ট্রের নিকট থেকে অধিকার ও সুযোগ সুবিধা ভোগ করেন এবং রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করেন। জন্মসূত্র ও অনুমোদসূত্র উভয়ভাবে নাগরিকতা লাভ করা যায়। তবে অনুমোদন সূত্রে নাগরিকতা অর্জন করতে গেলে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের বেশ কিছু শর্ত পূরণ করতে হয়। সুনাগরিকগণ রাষ্ট্রের সম্পদ। সুনাগরিককে বিবেকবান, বুদ্ধিদীপ্ত, সৎচরিত্রবান, রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্বপরায়ণ, ভোটপ্রদান করে যোগ্যপ্রার্থী নির্বাচন, কর প্রদান করা, গণতন্ত্রমনা, কল্যাণকামী, নৈতিক গুণাবলির অধিকারী ইত্যাদি গুণের অধিকারী হতে হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। লর্ড ব্রাইস সুনাগরিকের কয়টি গুণের উল্লেখ করেছেন?
ক) ৩টি খ) ৪টি
গ) ৫টি ঘ) ২টি

২। লর্ড ব্রাইস এর মতে সুনাগরিকের গুণ কোনটি?
ক) সত্যবাদিতা খ) দেশপ্রেম
গ) বিবেক ঘ) ভোট প্রদান

৩। জন্ম নীতি অনুসরণ করে কোন দেশ?
ক) বাংলাদেশ খ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
গ) বৃটেন ঘ) বৃটেন কোনটিই নয়

৪। জন্মস্থান নীতি অনুসরণ করে কোন দেশ?
ক) জাপান খ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
গ) ইতালী ঘ) ফ্রান্স

রচনামূলক প্রশ্ন

১. নাগরিক কে ?
২. নাগরিকতা কী? ব্যাখ্যা করুন।
৩. নাগরিকের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করুন
৪. সুনাগরিকের বৈশিষ্ট্য এবং গুণগুলো বর্ণনা করুন

৫. "একজন সুনাগরিক একজন বিবেকবান মানুষ"- উক্তিটি বিশ্লেষণ করুন ।
৬. রাষ্ট্রের একজন নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্রের প্রতি কী কী দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করেছেন তার একটি তালিকা তৈরি করুন।
৭. 'নগরে বাস করলেই সে সুনাগরিক নয়'- উক্তিটি বিশ্লেষণ করুন ।

৮। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

জনাব শাফী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পি.এইচ-ডি করতে গিয়ে সেখানে ফ্রান্সের এক মেয়ের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। সেখানে এই দম্পত্তির দুইজন সন্তান হয়েছে। বর্তমানে সন্তানদের প্রথম জন বাংলাদেশে এবং দ্বিতীয়জন ফ্রান্সের স্কুলে পড়াশুনা করে।

(ক) নাগরিকত্ব কী? ১
(খ) নাগরিকত্ব লাভের ২টি উপায় বর্ণনা করুন । ২
(গ) জনাব শাফীর সন্তানদ্বয় কে কোন দেশের নাগরিক তা যুক্তিসহ উপস্থাপন করুন । ৩
(ঘ) সন্তানদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে উদ্দীপকের আলোকে উক্ত দম্পত্তির ভূমিকা মূল্যায়ন করুন । ৪

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৬ : ১। ক ২। গ ৩। ক ৪। খ

পাঠ-২.৭ নেতৃত্ব, নেতার গুণাবলি ও দায়িত্ব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- নেতৃত্ব কী তা বলতে পারবেন।
- নেতৃত্বের শ্রেণীবিভাগ করতে পারবেন।
- নেতার গুণাবলি বর্ণনা করতে পারবেন।

নেতৃত্ব একটি গুণ। সমাজের প্রতিটা মানুষকে কোন না কোন ভাবে বা কোথাও নেতৃত্ব দিতে হয়। যেমনঃ কেউ পরিবারে, কেউ অফিসে, কেউ সমাজে, কেউ বিদ্যালয়ে, কেউ বা খেলার মাঠে নেতার ভূমিকায় অবতীর্ন হন। তাই প্রত্যেক মানুষকে নেতৃত্বের গুণাবলি অর্জন করা এবং নেতা হিসেবে ভূমিকা পালনের মনোভাব গড়ে তোলা দরকার। সমাজে যারা ভাল নেতৃত্ব দিতে পারেন তারা ক্যারিয়ারের শীর্ষে পৌঁছাতে পারেন।

নেতৃত্ব

নেতৃত্বকে ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। ইংরেজিতে 'লিডার' শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো পথ প্রদর্শন করা, চালনা করা, নির্দেশ দেওয়া, কর্মীদের মধ্যে কর্মতৎপরতা সৃষ্টি করা ও অগ্রনায়কের ভূমিকা পালন করা। নেতৃত্ব কোন নির্বাহীর নির্দেশনা, পথ প্রদর্শন ও অন্যদের কাজের উপর প্রভাব বিস্তারকারী একটি উদ্ভাবনী প্রক্রিয়া, যা ব্যক্তি ও সংগঠনের দ্বারা নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রযুক্ত হয় এবং এর ফলে ব্যক্তি ও সংগঠন উভয়ই চরম সন্তুষ্টির দিকে এগিয়ে যায়।

ব্যবস্থাপনা গবেষণায় গবেষকগণ নেতৃত্বের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। যেমনা Stogdill (১৯৫০) নেতৃত্ব সম্বন্ধে বলেছেন, "নেতৃত্ব হচ্ছে লক্ষ্য নির্ধারণ ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য একটি সংঘবদ্ধ কর্মীদের কার্যাবলি প্রভাবিত করার প্রক্রিয়া"। Hollander (1978) –এর মতে, "নেতৃত্ব নেতা এবং তাঁর অনুসরণকারীদের মধ্যে প্রভাব বিস্তারের একটি প্রক্রিয়া।" Koontz O'Donnel (1984) নেতৃত্বের সংজ্ঞায়িত করে বলেছেন, "এটা জনগণ প্রভাবিত করার একটি কৌশল বা প্রক্রিয়া, যাতে জনগণ আগ্রহভরে যৌথ লক্ষ্য অর্জনের জন্য সচেষ্ট হয়।" Rauch এবং Behling (1984) -এর মতে, "সংঘবদ্ধ দলের কার্যাবলিকে লক্ষ্য অর্জনের দিকে প্রভাবিত করার প্রক্রিয়াকে নেতৃত্ব আখ্যায়িত করা যেতে পারে।" অতএব সংগঠনে কর্মরত বিভিন্ন ব্যক্তির মন মানসিকতা, উদ্দেশ্য, ইচ্ছা-অনিচ্ছা ও আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটিয়ে মূল লক্ষ্য অর্জনের দিকে তাদের যাবতীয় ধ্যান ধারণা ও কর্ম প্রচেষ্টাকে নিয়োজিত করাই নেতৃত্বের কাজ।

নেতার ক্ষমতার ভিত্তি

ফ্রেঞ্চ (French,R.P.) ও র‍্যাভেন (Raven) নেতৃত্বের প্রভাব বিস্তারকারী পাঁচটি ক্ষমতার উল্লেখ করেছেন। যেমন-পুরষ্কার প্রদানের ক্ষমতা, বাধ্য করার ক্ষমতা, বিধানিক ক্ষমতা, শ্রদ্ধাজনিত ক্ষমতা, বিশেষায়িত ক্ষমতা।

এখানে উল্লেখ্য যে, উন্নয়নশীল দেশসমুহে রাজনৈতিক ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি বা প্রশাসনে নিয়োজিত ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক অনেক ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক ক্ষমতা থেকে অদৃশ্য অনানুষ্ঠানিক ক্ষমতা অপরের আচার আচরণ পরিবর্তনে অধিকতর প্রভাব বিস্তার করে।

নেতৃত্বের ধারণা

সনাতন ধারণাঃ নেতৃত্বের সনাতন ধারণা মূলত একনায়কের ধারণা। এরিস্টটলের মতে আজও অনেকে মনে করেন যে, "কেউ কেউ শাসন করার জন্য এবং কেউ শাসিত হওয়ার জন্য জন্মগ্রহণ করেন।" নেতৃত্ব সম্পর্কে এ ধরনের "শ্রেষ্ঠ মানব" বা গুণগত উৎকর্ষ সম্পর্কিত ধারণা ১৯৪০- এর দশকে বহুল প্রচলিত ছিল। তাদের মতে নেতৃত্ব হচ্ছে কতগুলো দৈহিক, মানসিক ও ব্যক্তিক গুণাবলির সম্মিলিত ফল। নেতাদের বিশিষ্ট কতকগুলো গুণ তাঁদের অনুসারীদের থেকে আলাদা

করে দেয়। এর অর্থ হলো নেতৃত্ব ব্যাপারটি জন্মসূত্রে প্রাপ্ত কতগুলো বিশেষ গুণের ফল। এই সহজাত শক্তির অভাব হলে সফল হওয়া যায় না। চেষ্টা বা সাধনার দ্বারা নেতা হওয়া চলে না। এ তত্ত্বের পরিবেশকগণ বলে থাকেন যে, বিশিষ্ট নেতাদের গুণাবলির হিসাব থেকেই এটা প্রতীয়মান হয়।

নেতৃত্বের সনাতন ধারণা অনুসারে নেতা তাঁর অধীনস্থদের উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। তিনি নির্দেশ দেন, অধীনস্থরা বিনা প্রতিবাদে তা মেনে নেন এবং সে নির্দেশ অনুসারে কাজ করেন। সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা কর্ম পরিচালনায় তাঁদের কোন অধিকার থাকে না। সনাতন ধারণা অনুসারে কোন প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও নেতা এক এবং তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

নেতৃত্বের আধুনিক ধারণা

নেতৃত্বের উপর ক্রমাগত গবেষণা ও চিন্তা-ভাবনার ফলে সনাতন ধারণাসমূহ ব্যর্থ বলে প্রতীয়মান হয়েছে। গবেষকদের মতে, আধুনিক নেতা সাধারণত কোন প্রতিষ্ঠানের প্রধান হয়ে থাকেন। তবে শুধু প্রতিষ্ঠান প্রধান হলেই নেতা হওয়া যায় না। নেতা হতে হলে তাঁকে নেতৃত্বের আধুনিক গুণাবলীর আচরণিক প্রকাশ ঘটাতে হবে। তিনি কোন ক্রমেই একনায়কের পরিচয় দেবেন না। তিনি তাঁর অধীনস্থদের সাথে আলোচনা করবেন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ বাস্তবায়নে ক্ষমতা প্রয়োগ না করে আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন। এ ছাড়াও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে ক্ষমতা প্রয়োগ না করে অধীনস্থদের এমনভাবে প্রভাবিত করবেন যাতে তাঁর ইচ্ছানুসারে কর্ম সম্পাদন করেন। তিনি অধীনস্থদের নিকট প্রয়োজন অনুসারে ক্ষমতা অর্পণ করবেন এবং তাঁদের সাথে সহকর্মী হিসেবে ব্যবহার করবেন। এক কথায় বলতে গেলে আধুনিক নেতৃত্বের ধারণা গণতান্ত্রিক। এ ছাড়া আরও কয়েক ধরনের নেতৃত্ব আছে -যেমন পিতৃসুলভ নেতৃত্ব, মুক্ত নেতৃত্ব, আধুনিক ও অনানুষ্ঠানিক নেতৃত্ব, গাঠনিক ও ব্যক্তিক নেতৃত্ব ও কর্মকেন্দ্রিক নেতৃত্ব ও কর্মীকেন্দ্রিক নেতৃত্ব।

তবে এ কথাও সত্য যে, নেতৃত্বের আধুনিক ধারণা সনাতন ধারণাকে একেবারেই বাদ দেয় না। প্রতিষ্ঠানে এমন জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে, যখন প্রভাব খাটিয়ে গণতান্ত্রিক উপায়ে কর্ম সম্পাদন সম্ভব হয় না। এ অবস্থায় নেতৃত্বের সনাতন পদ্ধতি সর্বশেষ পন্থা হিসাবে কাজে লাগাতে হয়।

নেতৃত্ব ও প্রতিষ্ঠানের প্রধানের মধ্যে পার্থক্য

প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসাবে একজনকে প্রতিষ্ঠানের কাঠামোর মধ্যে নিযুক্ত সকল অনুসারীকে নেতৃত্ব দান করতে হয়। প্রতিষ্ঠান প্রধান বা আনুষ্ঠানিক নেতা হিসাবে তাঁরা নিজ পদের সাথে সংশ্লিষ্ট দায়-দায়িত্ব, কর্তব্য ও কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ভোগ করে থাকেন। এই ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি প্রয়োগ করে তাঁরা তাঁদের অধীনস্থ লোকদের কাজ এমনকি অনুভুতি ও আবেগ প্রভাবিত ও নির্দেশিত করতে পারেন। প্রতিষ্ঠান প্রধান হিসাবে অধীনস্থ কর্মীগণ তাঁদের কাজের জন্য প্রধানের কাছে দায়ী থাকেন। প্রতিষ্ঠান প্রধান প্রয়োজনবোধে অধীনস্থ কর্মীদের শাস্তি প্রদান বা পুরস্কৃত করতে পারেন।

অনেক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান প্রধানের মধ্যে নেতৃত্ব সুলভ গুণাবলীর অভাব দেখা দেয়। কিন্তু তবুও চাকুরিতে জ্যেষ্ঠতার কারণে বা অন্য কোন কারণে প্রধান হিসেবে নিযুক্তি পেয়ে থাকেন এবং অধীনস্থদের নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন। অধীনস্থদের শ্রদ্ধা না পেয়েও অনেকে প্রতিষ্ঠানের প্রধানের ক্ষমতা দিয়েই এই পদে টিকে থাকেন। সততা ও ব্যক্তিত্ব নেতৃত্বের এই বিশেষ দুইটি গুণের অভাব থাকলেও প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসাবে পদাধিকার বলে নেতৃত্ব প্রদান করেন। এই নেতৃত্ব প্রকৃতপক্ষে নেতৃত্ব নয়। তা প্রাতিষ্ঠানিক প্রধান মাত্র।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, নেতৃত্বসুলভ গুণের অধিকারী না হয়েও একজন প্রতিষ্ঠান প্রধান হিসেবে কাজ করতে পারেন, কিন্তু নেতা হতে পারেন না। নেতা হওয়ার জন্য নেতৃত্বের গুণাবলির আচরণিক প্রকাশ একান্ত প্রয়োজন। একজন প্রতিষ্ঠান প্রধানের মধ্যে নেতৃত্বসুলভ গুণাবলির আচরণিক প্রকাশ ঘটলে তিনি প্রতিষ্ঠানের প্রধান এবং একজন নেতা হিসাবে স্বীকৃতি পাবেন।

নেতা হিসাবে টিকে থাকার জন্য অনুসারীদের স্বীকৃতি ও আনুগত্য অর্জন অপরিহার্য। নেতৃত্বসুলভ গুণের আচরণিক প্রকাশের মাধ্যমেই শুধু তাঁর পক্ষে এটা সম্ভব। এ জন্য এ ধরনের নেতাকে তাঁর কর্ম পরিস্থিতি ও নিজ আচরণ সম্পর্কে সব সময় সচেতন থাকতে হয়।

নেতার গুণাবলি

এক কথায় নেতার গুণাবলি প্রকাশ করা কঠিন। কোন কোন গবেষক ও লেখকের মতে কম-বেশি প্রতিটি নেতার কারিগরি নৈপুণ্য, চিরন্তন নৈপুণ্য এবং আচরণিক নৈপুণ্যের অধিকারী হওয়া অপরিহার্য। এখানে শিক্ষা ক্ষেত্রে নেতৃত্বের কিছু বিবরণ দেওয়া হলো-

(১) দক্ষতার দৃষ্টিকোণ থেকে নেতার গুণাবলি

নেতৃত্বের আচরণের দৃষ্টিকোণ থেকে কোন নেতার গুণাবলিকে মোটামুটিভাবে তিন ধরনের দক্ষতায় ভাগ করা যেতে পারে, যদিও এই গুণগুলো সম্পূর্ণভাবে পৃথক করা যায় না। যথা:

(ক) কারিগরি দক্ষতা

(খ) মানবিক সম্পর্ক দক্ষতা

(গ) সামগ্রিক পরিস্থিতি অনুধাবন ক্ষমতা

(ক) কারিগরি দক্ষতা

ব্যবস্থাপনার মধ্য পর্যায়ে বা নিম্ন পর্যায়ে এই ধরনের দক্ষতা গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুত কর্মক্ষেত্রে কোন হিসাবরক্ষণ অফিসার, প্রকৌশলী বা স্টেনোগ্রাফার ইত্যাদি পেশাদার ব্যক্তির অর্জিত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা প্রভৃতি তাঁর কারিগরি দক্ষতা। কোন ব্যক্তির অন্যান্য কর্মীদের নেতৃত্ব দেবার ভিত্তি হলো এই কারিগরি জ্ঞান। তবে পদোন্নয়নের মাধ্যমে একজন ব্যবস্থাপক উত্তরোত্তর সংগঠনের যতই উপরের স্তরে উন্নীত হন ততই কারিগরি দক্ষতা তাঁর জন্য কম প্রয়োজন হবে এবং অন্যান্য দক্ষতার প্রয়োজন বৃদ্ধি পাবে।

(খ) মানবিক সম্পর্ক দক্ষতা

মানবিক সম্পর্ক দক্ষতা বলতে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সকল কর্মচারী, নির্বাহী ও ব্যবস্থাপকের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক অনুধাবনের ক্ষমতাকে বোঝায়। প্রতিষ্ঠানে টিম বিল্ডিং স্পিরিট গড়ে তোলার জন্য সকল ব্যক্তির মধ্যে ও ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রভাব ও মনোভাব ইত্যাদি যথাযথভাবে উপলব্ধি ব্যবস্থাপনা কাজের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

সামগ্রিক পরিস্থিতি অনুধাবন ক্ষমতা

সামগ্রিক পরিস্থিতি অনুধাবন ক্ষমতা বলতে কোন প্রতিষ্ঠানের আদর্শগত, কাঠামোগত ও বৃহত্তর আঙ্গিকে সম্পর্কসমূহ এবং দীর্ঘকালীন পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়ে বিচার-বিবেচনা করাকে বোঝায়। এই ধরনের ক্ষমতা ও ধারণা প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ স্তরের ব্যবস্থাপকদের জন্যই সর্বাদিক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তারাই সংগঠনের মৌলিক নীতি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেন।

নেতার সামগ্রিক গুণাবলি

যে সকল গুণ বা বৈশিষ্ট্য সাধারণত নেতার মধ্যে থাকা আবশ্যক সেগুলো মোটামুটিভাবে নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

(ক) শারীরিক বৈশিষ্ট্য

নেতাকে কায়িক ও মানসিক উভয় প্রকার শ্রমদানের মাধ্যমে কাজ সম্পন্ন করতে হয়। কাজেই নেতৃত্ব শ্রমসাধ্য কাজ। নেতাকে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ও কর্মোদ্যোগী হতে হবে। নেতাকে অদম্য উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে নিরলস পরিশ্রম করে যেতে হয়। ফলে তাঁকে যথেষ্ট শারীরিক ও মানসিক শক্তির অধিকারী হতে হয়। তা না হলে তাঁর পক্ষে উদ্দেশ্য অর্জন সম্ভবপর হয় না।

(খ) **সামাজিক পটভূমি**

শিক্ষা ও সামাজিক অবস্থান ঃ নেতাকে শিক্ষিত হতে হবে। উপযুক্ত শিক্ষা নেতার মধ্যে বিশ্লেষণ ক্ষমতা, আন্তরিকতাবোধ, অধ্যবসায়, আত্নসমালোচনা ও অনুসন্ধিৎসুমনা প্রভৃতি গুণের সমাবেশ ঘটাবে।

সামাজিক দিক থেকেও নেতাকে উপযুক্ত মর্যাদার অধিকারী হতে হবে। সামাজিক অবস্থানে নেতা যদি যথাযথ মর্যাদার অধিকারী না হন তবে তাঁর পক্ষে নেতৃত্ব দেওয়া সম্ভব হবে না।

(গ) বুদ্ধিমত্তা ও যোগ্যতা

নেতাকে অবশ্যই ন্যায়পরায়ণ হতে হবে এবং তাঁর বুদ্ধিদীপ্ততা ও বিচার ক্ষমতা থাকতে হবে। নেতার কর্মী নির্বাচন ও কর্মপন্থা অনুসরণে এর সকল গুণ থাকা একান্ত প্রয়োজন । বিচার-বিবেকহীন লোককে অধীনস্থরা মনে প্রাণে নেতা বলে গ্রহণ করতে পারে না। তা ছাড়াও তাঁর শিক্ষাদানের যোগ্যতা ও বাগ্মিতা থাকতে হবে। একজন উত্তম নেতা হলেন উত্তম শিক্ষক।

(ঘ) মোহনীয় ব্যক্তিত্ব

নেতার ব্যক্তিত্ব হবে স্নেহ, গাম্ভীর্য ও কর্তৃত্ব মিশ্রিত অনন্যরূপে পরিস্ফুট। নেতার থাকতে হবে মানিয়ে নেওয়ার মানসিকতা। তার জন্য নেতার পরিবেশ ও সংগঠন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে এবং মানব চরিত্র অনুধাবনের ক্ষমতা থাকতে হবে। নেতাকে সব কাজেই অগ্রণী ভুমিকা পালন করতে হয়। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁকে ‘dashing and pushing’গুণের অধিকারী হতে হবে। নেতার সুদূর প্রসারী কল্পনা শক্তি থাকা আবশ্যক এবং তিনি হবেন ভবিষ্যত দ্রষ্টা।

সারসংক্ষেপ

নেতৃত্ব কোন নির্বাহীর নির্দেশনা, পথ প্রদর্শন ও অন্যদের কাজের উপর প্রভাব বিস্তারকারী একটি উদ্ভাবনী প্রক্রিয়া, যা ব্যক্তি ও সংগঠনের দ্বারা নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রযুক্ত হয় এবং এর ফলে ব্যক্তি ও সংগঠন উভয়ই চরম সন্তুষ্টির দিকে এগিয়ে যায়। ফ্রেঞ্চ (French, R.P.) ও র‌্যাভেন (Raven) নেতৃত্বের প্রভাব বিস্তারকারী পাঁচটি ক্ষমতার উল্লেখ করেছেন। যেমন- পুরস্কার প্রদানের ক্ষমতা, বাধ্য করার ক্ষমতা, বিধানিক ক্ষমতা, শ্রদ্ধাজনিত ক্ষমতা, বিশেষজনিত ক্ষমতা। নেতাকে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ও কর্মোদ্যোগী, ন্যায়পরায়ণ, বুদ্ধিদীপ্ত, বিচার ক্ষমতা সম্পন্ন এবং মোহনীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ইংরেজিতে ‘লিডার’ শব্দের আভিধানিক অর্থ কী?
- ক) নির্যাতন করে কাজ আদায় খ) নির্দেশ চাপিয়ে কাজ আদায়
- গ) মিষ্ট কথায় কাজ আদায় ঘ) কঠোর নিয়ন্ত্রণ করে কাজ আদায়

২। “কেউ কেউ শাসন করার জন্য এবং কেউ কেউ শাসিত হওয়ার জন্য জন্মগ্রহণ করেন”- উক্তিটি কার?
- ক) এ্যারিস্টটল খ) সক্রেটিস
- গ) প্লেটো ঘ) রুশো

রচনামূলক প্রশ্ন

১। নেতৃত্ব বলতে কী বোঝায়? নেতা ও প্রতিষ্ঠানের প্রধানের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করুন।
২। নেতার গুণাবলি বর্ণনা করুন ।
৩। “নেতার সুদুরপ্রসারী কল্পনা শক্তি থাকা আবশ্যক এবং তিনি হবেন ভবিষ্যত দ্রষ্টা”- এই উক্তির যথার্থতা বিশ্লেষণ করুন ।
“কেউ কেউ শাসন করার জন্য এবং কেউ কেউ শাসিত হওয়ার জন্য জন্মগ্রহণ করেন-উক্তিটি ব্যাখ্যা করুন।”

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৭ : ১। খ ২। ক

পাঠ-২.৮ প্রেষণা, প্রেষণা চক্র ও প্রেষণার বৈশিষ্ট্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- প্রেষণার সংজ্ঞা বলতে পারবেন।
- প্রেষণা চক্র ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- প্রেষণার বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করতে পারবেন।

প্রাণীর অন্তর্নিহিত শক্তি যেভাবে উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য গতি লাভ করে এবং নির্দিষ্ট দিকে পরিচালিত হয় তাকে প্রেষণা বলে। সেজন্যই প্রেষণাকে আচরণের চালিকা শক্তি বলে। যে কাজ ব্যক্তির কোন ইচ্ছাকে পূরণ করতে সমর্থ হয় সে ঐ কাজটিই করতে উৎসাহ বোধ করবে। সুতরাং দেখা যায় যে, প্রেষণা ব্যক্তির আচরণে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে এবং সময় ও স্থান বিশেষে কোন কোন আচরণের সংঘটনের সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে দেয়। এই পাঠে প্রেষণা, প্রেষণা চক্র এবং প্রেষণার বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা হবে।

প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, চলুন আমরা নিচের গল্পটি পড়ি।

রুবাব ও যারিন দুই বোন। তারা দুই বোন ওয়াইজম্যান স্কুল এ্যান্ড কলেজের ছাত্রী। গ্রীষ্মের ছুটিতে তারা বাবা মায়ের সাথে গ্রামের বাড়িতে রওনা হয়। ঢাকা থেকে তারা অভি এন্টার প্রাইজে সিরাজগঞ্জ শহরে যায়। এরপর তারা রিক্সা করে শিয়ালকোল বাজারে পোঁছায়। শিয়ালকোল থেকে তারা পায়ে হেটে বড় হামকুড়িয়া গ্রামের দিকে রওনা হয়। কিছু দূর যেতেই রুবাব তৃষ্ণা অনুভব করে। কিন্তু তারা ভুলে পানির বোতল গাড়িতে ফেলে আসে। কিছুক্ষণের মধ্যে রুবাবের পিপাসা আরও বেড়ে যায়। আসেপাশে কোন বাড়ি না থাকায় কোথাও পানির সন্ধান পাওয়া যাচ্ছিল না । এমন অবস্থায় সে তৃষ্ণায় ছটফট করতে থাকে এবং পানি খুঁজতে থাকে। একটু সামনে যেতেই রুবাব দেখতে পায় গভীর নলকূপের পানি দিয়ে কৃষক জমিতে সেচ দিচ্ছে। সে রাস্তা থেকে নেমে দৌড়িয়ে নলকূপের কাছে যায় এবং দুই হাতে পানি নিয়ে পান করে। পানি পানের পর রুবাব অনেক আরাম অনুভব করে। এরপর সে সবার সাথে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয়।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আপনারা কি বলতে পারেন রুবাব কেন ছোটাছুটি করতে ছিল। হ্যাঁ বন্ধুরা, রুবাব তৃষ্ণার্ত থাকায় পানি পানের জন্য ছোটাছুটি করতে ছিল। বন্ধুরা, তৃষ্ণার্ত হবার পর রুবাবের পানি পানের জন্য যে কর্ম প্রচেষ্টা এটাই হল প্রেষণা।

প্রেষণা শব্দটির উৎপত্তি বাংলা প্রেষ শব্দ থেকে যার অর্থ চাপ। মনোবিজ্ঞানে প্রেষণা শব্দটিকে অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। প্রেষণা এমন একটি অবস্থাকে বুঝায় যা মানুষকে কোন আচরণ করতে উদ্বুদ্ধ করে থাকে বা তাকে ঐ আচরণের দিকে চালিত করে। আমাদের চাহিদা বা অভাববোধ থেকে মনের ভেতরে বা বাইরে চাপ সৃষ্টি হয় এবং তার ফলে কোন লক্ষ্য অর্জনের জন্য মনে যে তাড়না, তাগিদ বা উদ্যম সৃষ্টি হয় তাকেই প্রেষণা বলা হয়।

প্রেষণা সৃষ্টির মূলে রয়েছে কোন কিছুর অভাব, এবং সেই অভাব দূর করার জন্য ব্যক্তির মধ্যে এক ধরনের শক্তি বা তাড়নার সৃষ্টি হয় যা তাকে ঐ অভাব পূরণ করার লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যায়। তাছাড়া অভাব সৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথে তার মধ্যে অভাব পূরণের উপায় সম্পর্কে একটি ধারণা সৃষ্টি হয়, একে বলে উদ্দেশ্য। অতঃপর সে ঐ উদ্দেশ্যমূলক আচরণ করে অভাব পূরণ করে অর্থাৎ লক্ষ্যবস্তু অর্জন করে। প্রাণীর জীবনে প্রেষণার এই অবস্থাগুলিকে ধারাবাহিকভাবে সাজালে নিম্নরূপ একটি চিত্র পাওয়া যায়, একে বলে প্রেষণার চেইন বা শিকল। আবার এই শিকলকে চক্রাকারে সাজালে যা পাওয়া যাবে তা হল প্রেষণা চক্র।

চাহিদা → তাড়না → উদ্দেশ্য → আচরণ → লক্ষ্য অর্জন → চাহিদার পরিসমাপ্তি →

প্রেষণা একটি অবিরাম প্রক্রিয়া কারণ মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত প্রাণীর অভাববোধ থেকেই যায়, তা কখনো শেষ হয়না। অতএব এক প্রেষণার পরিসমাপ্তি হলে অপর প্রেষণার সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ মানুষ আবার আর একটি প্রেষিত আচরণের জন্য সক্রিয় হয়। এভাবে তার জীবনব্যাপী কোন না কোন প্রেষিত আচরণ চলতেই থাকে।

প্রেষণার উৎস

অপরিতৃপ্ত মানসিক ও জৈবিক চাহিদা মানুষের মনে একটি অস্থিরতা সৃষ্টি করে, এই অস্থিরতার ফলে মানুষের আচরণে তাড়নার সৃষ্টি হয়। যতক্ষণ না তার চাহিদার তৃপ্তি ঘটে ততক্ষণ এই তাড়না ক্রিয়াশীল থাকে। অতএব অভাববোধ বা চাহিদাই প্রেষণার প্রাথমিক উৎস। জৈবিক বা শারীরিক চাহিদাগুলো হলো অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, পানীয়, বিশ্রাম, চঞ্চলতা, যৌনাকাঙ্ক্ষা, আলো, বাতাস, মল-মূত্র ত্যাগ ইত্যাদি। মানসিক চাহিদা হলো স্বীকৃতি, নিরাপত্তা, প্রেম, ভালবাসা, কৌতুহল, সৌন্দর্য পিপাসা, ব্যক্তিত্বের বিকাশ ইত্যাদি। এই সব চাহিদা থেকে আমাদের বাসনা, ইচ্ছা, অনুরাগ বা আকাঙ্খা সৃষ্টি হয় এবং কোন কিছু অর্জনের জন্য চালিত করে। প্রেষণার ফলে সৃষ্ট চাহিদা শক্তি মানুষের সকল কর্মপ্রেরণার উৎস।

প্রেষণা চক্র

প্রেষণা-চক্রের প্রাথমিক অবস্থায় প্রাণী বা মানুষ কোন কিছুর অভাবজনিত কারণে অস্থিরতা অনুভব করে, তারপর তা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য প্রাণী বা মানুষ কতগুলো আচরণ করা, সবশেষে কাংক্ষিত বস্তুটি পেলেই সেই অস্থিরভাব দূর হয় এবং সে তৃপ্তি লাভ করে। কিছু সময় পরে, প্রাণী বা মানুষের আবার প্রেষণা সৃষ্টি হয়। এভাবেই প্রেষণা চক্র আবর্তিত হয়। চিত্রটি লক্ষ করুন:

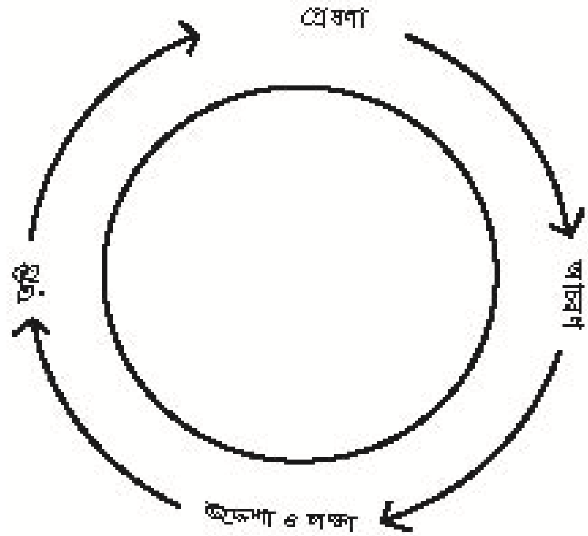

আমাদের শরীরে পানির অভাববোধ থেকেই আমরা তৃষ্ণার্ত হই। আমরা পানি পান করার জন্য উদগ্রীব হয়ে পড়ি বা অস্থির হয়ে পড়ি। এটি হলো প্রথম ধাপ। দ্বিতীয় ধাপে পানি পাওয়ার জন্য এবং পান করার জন্য আমরা কিছু আচরণ করে থাকি। পানি পান করাতে তৃতীয় ধাপে আমাদের উদ্দেশ্য সাধিত হয়। আমরা পরিতৃপ্ত হই। কয়েক ঘণ্টা যাওয়ার পর শারীরিক প্রয়োজনে আমরা আবার পানির অভাব বোধ করি এবং তৃষ্ণার্ত হই। আমরা আবার পূর্বের ন্যায় আচরণ করে থাকি। এভাবেই আমাদের আচরণ আবর্তিত হয় বিশেষ কোন প্রেষণাকে ঘিরে।

প্রেষণার বৈশিষ্ট্য

মানুষের মধ্যে যেকোন আচরণ সংঘটিত হলেই যে তা প্রেষিত হবে তা বলা যায় না। কারণ সব আচরণই প্রেষিত না হয়ে অন্য কিছু হতে পারে। প্রেষিত আচরণ হওয়ার জন্য যে বৈশিষ্ট্য রয়েছে যদি সেগুলি আচরণের পেছনে না থাকে তবে তাকে প্রেষিত আচরণ বলা যাবেনা। নিচে প্রেষণার এই বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে আলোচনা করা হল:

১. **ব্যক্তিগত চাহিদা থেকেই প্রেষণার সৃষ্টি:** ব্যক্তি নিজে থেকেই কোন কিছুর অভাব বোধ না করলে তার মধ্যে কোন প্রেষণার সৃষ্টি হবে না। তবে এই অভাববোধ স্বয়ংক্রিয়ভাবেও নিজের মধ্যে সৃষ্টি হতে পারে অথবা বাহ্যিক চাপের ফলেও তা হতে পারে। যেমন, ব্যক্তি যখন অনুভব করে যে তার ক্ষুধা পেয়েছে তখনই সে খাদ্যের সন্ধানে বের হবে।

২. **প্রেষিত আচরণ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়:** প্রেষণা মানুষ বা প্রাণীকে কোন বিশেষ লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করে। অর্থাৎ সে কী করতে চায় সে ব্যাপারে নিশ্চিত থাকে যেমন, ক্ষুধা বোধ করলে মানুষ কেবল খাদ্যেরই সন্ধান করবে, পানির সন্ধান করবেনা।

৩. **প্রেষিত আচরণ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে:** যে অভাব থেকে প্রেষণার সৃষ্টি হয়েছে তা যদি পুরণ করতে দীর্ঘ সময়েরও প্রয়োজন হয় তবুও মানুষ ধৈর্যের সাথে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকবে।

সারসংক্ষেপ

প্রাণীর অন্তর্নিহিত শক্তি যেভাবে উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য গতি লাভ করে এবং নির্দিষ্ট দিকে পরিচালিত হয় তাকে প্রেষণা বলে। প্রেষণা সৃষ্টির মূলে রয়েছে কোন কিছুর অভাব, এবং সেই অভাব দূর করার জন্য ব্যক্তির মধ্যে এক ধরণের শক্তি বা তাড়নার সৃষ্টি হয় যা তাকে ঐ অভাব পূরণ করার লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যায়। তাছাড়া অভাব সৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথে তার মধ্যে অভাব পুরণের উপায় সম্পর্কে একটি ধারণা সৃষ্টি হয়, একে বলে উদ্দেশ্য। অতঃপর সে ঐ উদ্দেশ্যমূলক আচরণ করে অভাব পুরণ করে অর্থাৎ লক্ষ্যবস্তু অর্জন করে। প্রাণীর জীবনে প্রেষণার এই অবস্থাগুলিকে ধারাবাহিকভাবে সাজালে নিম্নরূপ একটি চিত্র পাওয়া যায়, একে বলে প্রেষণার চেইন বা শিকল। আবার এই শিকলকে চক্রাকারে সাজালে যা পাওয়া যাবে তা হল প্রেষণা চক্র। প্রেষণার বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ:

১. ব্যক্তিগত চাহিদা থেকেই প্রেষণার সৃষ্টি।
২. প্রেষিত আচরণ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়।
৩. প্রেষিত আচরণ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. প্রেষণা শব্দটি বাংলা কোন শব্দ থেকে এসেছে?
ক) প্রেষ খ) প্রেস
গ) প্রেশ ঘ) পেষ

২. প্রেষণা কোন ধরনের প্রক্রিয়া?
ক) সবিরাম খ) অবিরাম
গ) জটিল ঘ) সরল

৩. প্রেষিত আচরণের বৈশিষ্ট্য কোনটি?
ক) উদ্দেশ্যহীন খ) কষ্টদায়ক
গ) উদ্দেশ্য প্রণোদিত ঘ) ক্ষণস্থায়ী

রচনামূলক প্রশ্ন

১. প্রেষণা বলতে কী বোঝায়? প্রেষণা চক্রটি ব্যাখ্যা করুন।
২. প্রেষণার বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৮ : ১. ক ২. খ ত. গ

পাঠ-২.৯ প্রেষণার প্রকারভেদ ও ক্যারিয়ার গঠনে প্রেষণার গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- প্রেষণার শ্রেণিবিভাগ করতে পারবেন।
- বিভিন্ন প্রকার প্রেষণার বিবরণ দিতে পারবেন।
- ক্যারিয়ার গঠনে প্রেষণার ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পূর্ববর্তী পাঠ থেকে আমরা জেনেছি যে প্রেষণা একটি মনোবৈজ্ঞানিক ধারণা। প্রেষণাকে আঙ্গুল দিয়ে দেখানো যায় না বরং প্রেষণার ফলে যদি কোন ব্যক্তির মধ্যে কোন আচরণের সৃষ্টি হয় তবেই বোঝা যায় যে ঐ ব্যক্তি প্রেষিত আচরণ করছে। একইভাবে প্রেষণার শ্রেণিবিভাগের ব্যাপারেও মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেক মতভেদ রয়েছে। প্রেষণার ধরন, বৈচিত্র্য বা প্রকৃতি অনুযায়ী এটাকে নানাভাবে বিভক্ত করা হয়েছে। যেমন প্রকৃতি অনুযায়ী মনোবিজ্ঞানীরা প্রেষণাকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন, যথাঃ জৈবিক প্রেষণা ও সামাজিক প্রেষণা। শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার গঠনে উভয় ধরনের প্রেষণাই অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বর্তমান পাঠে প্রেষণার শ্রেণিবিভাগ এবং ক্যারিয়ার গঠনে প্রেষণার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করা হল।

পর্ব-ক: প্রেষণার প্রকারভেদ

শিক্ষার্থী বন্ধুরা,

আমাদের অনেক চাহিদা বা প্রয়োজন রয়েছে। এসব চাহিদা থেকে আমাদের মধ্যে এক ধরনের তাড়না বা প্রেষণা সৃষ্টি হয়। এই প্রেষণাকে সাধারণত দৈহিক এবং সামাজিক এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। বন্ধুরা, দৈহিক ও সামাজিক কারণে আমাদের মধ্যে যেসব প্রেষণা সৃষ্টি হয় সেগুলো আমরা নিচের ছকে আলাদা করে লিখি এবং নিচের অনুচ্ছেদের সাথে মিলিয়ে নেই।

জৈবিক বা দৈহিক প্রেষণা	সামাজিক প্রেষণা

আমাদের প্রয়োজন অনেক, তাই আমাদের অভাবও অনেক। এই প্রয়োজন ও অভাব মেটাতে আমাদেরকে অনেক জিনিস গ্রহণ করতে হয়, আবার অনেক জিনিস ত্যাগ করতে হয়। প্রয়োজনটি হতে পারে জৈবিক বা মানসিক। প্রয়োজনের বিভিন্নতার জন্য প্রেষণাও বিভিন্ন হতে পারে। তবে মনোবিজ্ঞানীগণ প্রেষণাকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করেছেন। যথাঃ জৈবিক বা দৈহিক প্রেষণা ও মানসিক ও সামাজিক কারণে প্রেষণা।

আবার শিক্ষামূলক আচরণের ক্ষেত্রে প্ররোচনার দৃষ্টিকোণ থেকে প্রেষণাকে অন্য দুই ভাগেও বিভক্ত করা হয়েছে। যেমনঃ অন্তর্নিহিত প্রেষণা ও বাহ্যিক প্রেষণা।

জৈবিক প্রেষণা

যে প্রেষণাগুলো প্রাণীর জীবন ধারণে সহায়তা করে অর্থাৎ তাকে বাঁচিয়ে রাখে সেগুলিকেই জৈবিক প্রেষণা বলে। যেমন, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, কাম, প্রবৃত্তি ইত্যাদি। জৈবিক প্রেষণা প্রাণীর আচার-আচরণ ও কর্মপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেহেতু এই প্রেষণাগুলো জীবন ধারণের জন্য অপরিহার্য এবং জন্মগতভাবেই প্রাণী এসব অর্জন করে তাই এগুলিকে মুখ্য বা সহজাত প্রেষণাও বলা হয়ে থাকে। ইতর প্রাণীর ক্ষেত্রে জৈবিক প্রেষণাগুলো সহজ ও

অবিকৃতভাবে প্রকাশিত হয় কিন্তু সমাজ, সংস্কৃতি ও শিক্ষা-দীক্ষার প্রভাবে মানুষের বেলায় এসব প্রেষণা নিয়ন্ত্রিত ও ভদ্র রূপে প্রকাশ পায়। তবে কখনো কখনো আবার কোন জৈবিক প্রেষণা মানুষের মধ্যে বিকৃতভাবেও প্রকাশিত হতে পারে।

সামাজিক প্রেষণা

সমাজে বেঁচে থাকার জন্য মানুষের মধ্যে এমন কতগুলো চাহিদা সৃষ্টি হয় যা তাকে জীবনে প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি এনে দেয়। কতক সামাজিক প্রেষণা আছে যেগুলো আপাতত দৃষ্টিতে সহজাত মনে হলেও সেগুলো প্রধানত শিক্ষালব্ধ ও সামাজিক। যেমন, কৃতিত্ব, প্রভাব, প্রতিপত্তি, খ্যাতি, স্বাধিকার, আনুগত্য, দলভুক্তি, মর্যাদা লাভ ইত্যাদি সামাজিক প্রেষণার উদাহরণ। জৈবিক প্রেষণার মত সামাজিক প্রেষণার কোন শারীরিক ভিত্তি নেই তবে সমাজ, সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক পটভূমির প্রেক্ষিতে মানুষের মধ্যে এগুলোর বিকাশ ঘটে। সামাজিক প্রেষণা জীবন ধারণের জন্য অপরিহার্য না হলেও মানুষের কাজকর্ম ও জীবন ধারণের সাথে এগুলোর ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। প্রাণীর বিভিন্ন আচরণের তাৎপর্য বুঝতে হলে জৈবিক প্রেষণার পাশাপাশি সামাজিক প্রেষণা সম্পর্কেও সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকা দরকার।

অন্তর্নিহিত প্রেষণা

জৈবিক বা সামাজিক কারণ ছাড়াও মানুষের অন্তস্থ কিছু চাহিদা পূরণের জন্যও প্রেষণার সৃষ্টি হয়ে থাকে, এ ধরনের প্রেষণাকে অন্তর্নিহিত প্রেষণা বলা হয়। যেমন, কখনো কখনো খেলতে বসলে বা পড়তে বসলে আমরা সে কাজে এতই মেতে থাকি যে খাওয়ার কথাও ভুলে যাই। এখানে খেলা বা পড়ার প্রতি যে আকর্ষণ তা এক ধরনের অন্তর্নিহিত প্রেষণা। আগ্রহ, উৎসাহ, কোন কাজে তৃপ্তি ইত্যাদি অন্তর্নিহিত প্রেষণার উদাহরণ।

বাহ্যিক প্রেষণা

আমাদের সবার মধ্যেই প্রচুর পরিমাণে জৈবিক ও সামাজিক চাহিদা রয়েছে যার প্রেক্ষিতে আমরা বিভিন্ন আচরণ করে থাকি। আমাদের চারিপাশে এমন কিছু উপাদান রয়েছে যেগুলি উপরিউক্ত চাহিদা পূরণে বিশেষ সহায়তা করে যেমন, খাদ্য, বস্ত্র, পদমর্যাদা, পারিতোষিক, কিছু বস্তু সামগ্রী ইত্যাদি। এসব উপাদান প্রাপ্তির আশায় মানুষের মধ্যে যে প্রেষণা সৃষ্টি হয় তাই হল বাহ্যিক প্রেষণা।

কাজ-১

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, নিচের বৃত্ততে কতগুলো প্রেষণা লেখা আছে। কোন্টি কোন ধরনের প্রেষণা নিচের ছকে লিখুন এবং বইয়ের সাথে মিলিয়ে নিন।

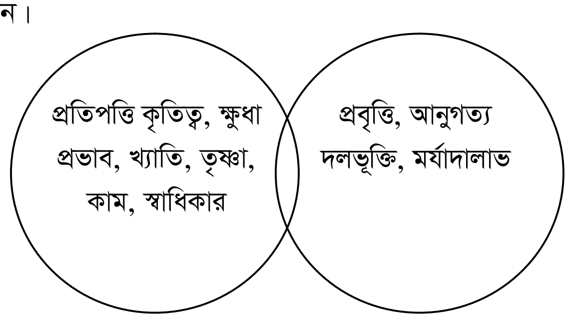

জৈবিক বা দৈহিক প্রেষণা	সামাজিক প্রেষণা

পর্ব-খঃ ক্যারিয়ার গঠনে প্রেষণার গুরুত্ব

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আসুন আমরা নিচের গল্পটি পড়ি।

আবিদ অষ্টম শ্রেণীর একজন মেধাবী ছাত্র। তার ইচ্ছা লেখাপড়া করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হবে। কিন্তু তার বাবা একজন গরীব কৃষক। একদিন আবিদের বাবা আবিদকে ডেকে বললেন, "বাবা আমরা গরীব মানুষ। লেখাপড়া আমাদের জন্য নয়। আমি সংসার চালাতেই হিমশিম খাচ্ছি, তোমার পড়ালেখার খরচ যোগাব কী করে? তার চেয়ে কাল থেকে তুমি আমার সাথে মাঠে কাজ কর। আমিও একটু আয়েশ পাব।" পরের দিন আবিদ কাঁদো কাঁদো স্বরে বিষয়য়টি তার প্রিয় শিক্ষক মফিজুর রহমান সাহেবকে বলল। মফিজুর রহমান সাহেব তাকে সাহস দিয়ে বললেন, হতাশ হতে নেই বাবা। সমস্যা আছে তার সমাধানও আছে। আগামী কাল থেকে তুমি আমার বাড়িতে জায়গীর থেকে পড়ালেখা করবে। আমি তোমার পড়ালেখার খরচ দিব। শিক্ষকের মুখে এমন আশার বাণী শুনে আবিদ অত্যন্ত আনন্দিত হল। বিষয়টি আবিদ তার বাবা-মাকে খুলে বললে তারাও অনেক খুশি হলেন। পরের দিন আবিদ শিক্ষকের বাসায় চলে গেল। শিক্ষক মফিজুর রহমান সাহেব তার স্ত্রী, এবং ছেলেমেয়েরাও খুব আনন্দ চিত্তে তাকে গ্রহণ করল। এরপর থেকে আবিদ নিয়মিত লেখাপড়ার পাশাপাশি বাড়ির ছোটখাট অনেক কাজে মফিজুর রহমান এবং পত্নী লিলি বেগমকে সহযোগিতা করতে লাগল। তাদের সন্তান দীপা এবং অনিকের লেখাপড়ায়ও সহযোগিতা করতে লাগল। অল্প কয়েকে দিনের মধ্যে আবিদ বাড়ির মধ্যমণি হয়ে উঠল। এ বাড়ি থেকেই সে এসএসসি ও এইচএসসি উভয় পরীক্ষায় জিপিএ ৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়। পরবর্তীতে সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয় এবং টিউশন করে নিজের খরচ চালাতে থাকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিষয়ে অনার্স এবং মাস্টার্স উভয় পরীক্ষায় সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অর্জন করে। এরপর সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিষয়ে প্রভাষক পদের জন্য আবেদন করে। কর্তৃপক্ষ তার যোগ্যতা বিচার বিবেচনা করে যথাযথ প্রক্রিয়ায় প্রভাষক পদে নিয়োগ দান করে। এভাবেই আবিদ তার জীবনের লক্ষ্যে উপনীত হয়।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আপনারা কী বলতে পারেন কীভাবে আবিদ নানা বাধা পেরিয়ে তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে উপনীত হল? বন্ধুরা, আবিদের এই সফলতার মূলে রয়েছে তার অদম্য ইচ্ছাশক্তি। কোন কিছু পাবার প্রথম শর্ত হল ইচ্ছা বা চাহিদা। আর চাহিদা থেকেই প্রেষণার সৃষ্টি। প্রেষণার উপর নির্ভর করে শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ জীবন। অদম্য প্রেষণার কারণেই মানুষ চাঁদে যেতে পেরেছে, হিমালয় জয় করতে পেরেছে। শিক্ষার্থীদের শিখনের ক্ষেত্রেও প্রেষণা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মনোবিজ্ঞানীরা প্রেষণার ভূমিকাকে তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। যেমন, প্রেষণা:

(ক) শিক্ষামূলক আচরণে শক্তি যোগায়;
(খ) শিক্ষামূলক আচরণ নির্বাচন ও নির্ধারণ করে;
(গ) শিক্ষামূলক আচরণের গতিপথ নির্ণয় করে।

প্রেষণা শিক্ষামূলক আচরণে শক্তি যোগায়: শিক্ষা অর্জনের জন্যও মানসিক শক্তি ও উদ্যমের প্রয়োজন। শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু অর্জনের জন্য অন্তর্নিহিত ও বাহ্যিক প্রেষণাগুলিকে কাজে লাগিয়ে আমরা নিজেদের মধ্যে এই উদ্যম ও শক্তির সঞ্চার করি। যে সব শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে এই প্রেষণাগুলি দুর্বল বা নিচু স্তরে থাকে তারা শিক্ষার ব্যাপারে অত্যন্ত উদাসীন হয়।

প্রেষণা শিক্ষামূলক আচরণ নির্বাচন ও নির্ধারণ করে: ব্যক্তি শিক্ষা ক্ষেত্রে কী ধরনের আচরণ করবে তাও বহুলাংশে নির্ভর করে প্রেষণার গুণগত মানের উপর। যেমন, ব্যক্তির মধ্যে যদি বিশেষ কোন বিষয়ের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয় তবে যে কোন উপায়েই হোক না কেন সে ঐ বিষয় অর্জনের দিকেই ধাবিত হবে। প্রেষণামূলক নির্বাচনের একটি বৈশিষ্ট্য হলো যে, ব্যক্তি তার চাহিদার তৃপ্তির জন্য নানা রকম আচরণ করে এবং শেষ পর্যন্ত যে আচরণটি করে তার চাহিদা মিটে শুধু সেই আচরণটিই সে ভাল করে শিখে, বাকী আচরণগুলি আর শিখতে চেষ্টা করে না।

প্রেষণা শিক্ষামূলক আচরণের গতিপথ নির্ণয় করে: প্রেষণার আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো ব্যক্তির আচরণকে সঠিক লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করা। বিচ্ছিন্নভাবে আচরণ করলে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছানো সম্ভব হয়না। যেমন, কেউ যদি পরীক্ষায় ভাল ফল করতে চায় তবে তাকে নিয়মিতভাবে পড়াশুনা চালিয়ে যেতে হবে এবং সেই সাথে শিক্ষকদের সাথে যোগাযোগ রেখে সঠিকভাবে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, শিক্ষার্থীর ক্যারিয়ার গঠনের জন্য প্রয়োজন গুণগত মানের শিক্ষা। শিক্ষা ছাড়া কোন কাজেই সফলতা অর্জন করা যায় না। তাই শিক্ষাকে উন্নয়নের চাবিকাঠি বলা হয়। আর শিক্ষার জন্য প্রয়োজন শিক্ষার্থীর প্রেষণা। প্রেষণা শুধু শিক্ষা ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং জীবনের সকল ক্ষেত্রেই চালিকা শক্তি হয়ে কাজ করে। এজন্য শৈশব থেকেই

প্রত্যেকের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে। তাহলে লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য নিজের মধ্যে প্রেষণা জাগ্রত হবে এবং লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হবে। যেমন, কোন শিক্ষার্থী যদি শৈশব থেকে ইচ্ছা পোষণ করে সে ডাক্তার হবে। তাহলে তাকে অনেক অধ্যয়ন করতে হবে, বিজ্ঞান বিভাগে পড়তে হবে, ভাল ফলাফল করতে হবে, ভর্তি পরীক্ষায় চান্স পেতে হবে এবং ভর্তির পর এমবিবিএস পাশ করতে হবে। তাহলেই না একজন ডাক্তার হওয়া সম্ভব। লক্ষ্য নির্ধারণ করলে পরবর্তী কর্মপ্রচেষ্টা আপনা আপনি আসে। লক্ষ্য ব্যক্তির মধ্যে প্রেষণা সৃষ্টি করে ব্যক্তিকে সফলতার পথে চালিত করে। সুতরাং ক্যারিয়ার গঠনে প্রেষণার ভূমিকা অপরিসীম।

সারসংক্ষেপ

ক্যারিয়ার গঠনে প্রেষণা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রেষণাকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন, জৈবিক ও সামাজিক। জৈবিক প্রেষণা হল যা মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করে তাই। যেমন- কৃতিত্ব, প্রভাব, প্রতিপত্তি, দলভুক্তি, স্বাধিকার ইত্যাদি। এছাড়া প্রেষণার উৎস অনুযায়ী একে অন্তর্নিহিত বা বাহ্যিক এই দুই ভাবেও ভাগ করা যায়। প্রেষণা মানুষের আচরণে শক্তি যোগায়, তার শিক্ষামূলক আচরণ নির্ধারণ করে এবং আচরণের গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. কোনটি জৈবিক প্রেষণা?
   - ক) কৃতিত্ব
   - খ) প্রভাব
   - গ) প্রতিপত্তি
   - ঘ) ক্ষুধা

২. কোনটি সামাজিক প্রেষণা?
   - ক) তৃষ্ণা
   - খ) নিদ্রা
   - গ) খ্যাতি
   - ঘ) কাম প্রবৃত্তি

৩. কোনটি অন্তর্নিহিত প্রেষণা?
   - ক) খাদ্য
   - খ) উৎসাহ
   - গ) বস্ত্র
   - ঘ) পদমর্যদা

৪. কোনটি বাহ্যিক প্রেষণা?
   - ক)আগ্রহ
   - খ)উৎসাহ,
   - গ) কোন কাজে তৃপ্তি
   - ঘ) বস্ত্র

রচনামূলক প্রশ্ন

- প্রেষণার শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা করুন।
- জৈবিক ও সামাজিক প্রেষণার পার্থক্য আলোচনা করুন।
- ক্যারিয়ার গঠনে প্রেষণার ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৯ : ১। ঘ ২। গ ৩। খ ৪। ঘ

পাঠ-২.১০ আগ্রহ ও মনোযোগ এবং ক্যারিয়ার গঠনে আগ্রহ ও মনোযোগের গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- আগ্রহ কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- মনোযোগ কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ক্যারিয়ার গঠনে আগ্রহ ও মনোযোগের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

আমরা দেখেছি একজন ক্যারিয়ারসম্পন্ন ব্যক্তির অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হল তিনি নিরলস পরিশ্রম করতে পারেন। অন্যান্য অনেক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কাজের প্রতি অনুরাগ এবং ক্লান্তিহীনভাবে কাজ করতে পারা তার একটি বৈশিষ্ট্য। কিন্তু একজন মানুষের কাজের প্রতি অনুরাগ তখনই জন্মে যখন সে কাজটি করতে ভালবাসে বা আনন্দ পায়। অর্থাৎ কাজটির প্রতি সে আগ্রহী হয়। কাজটি যদি তার নিজের বা অপরের কোন প্রয়োজন মেটাতে পারে বা কাজটি করে দেশ ও দশের কোন উপকার হয় তবে সে কাজটি করতে তার আগ্রহ জন্মাবে। অন্য কথায় বলা যায়, যে কাজের চাহিদা আছে মানুষ সে কাজ করতে আগ্রহী হয়। আগ্রহ থাকলে সে কাজটি এমনভাবে করবে যেন কাজটি শতকরা একশ ভাগ ফলপ্রসূ হয়। এর জন্য চাই মনোযোগ। সে যদি নিরবিচ্ছিন্ন মনোযোগ দিয়ে কাজটি করে তবে তার ফলাফল হবে পরিপূর্ণ। দেখা যায়, কোন কাজে ব্যক্তির আগ্রহ থাকলে স্বাভাবিকভাবে সে সেটি করতে পূর্ণ মনোযোগ দেয়। মানসিক, শারীরিক বা কোন পরিবেশগত কারণে যদি সে অখণ্ড মনোযোগ নাও দিতে পারে তবে সে তার সম্পূর্ণ ইচ্ছা কাজে লাগিয়ে কাজটি সম্পন্ন করে। সুতরাং কাজের প্রতি আগ্রহ ও মনোযোগ কাজকে সুচারুরূপে সমাধান করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মনোযোগ দিয়ে কাজ করে ব্যক্তি সার্থকতার চরম শিখরে পৌঁছতে পারে।

কাজ - এক

আপনার আগ্রহ আছে এমন পাঁচটি বিষয়ের নাম লিখুন। যেমন, সঙ্গীত, জনসেবামূলক কোন কাজ ইত্যাদি। প্রতিটি বিষয়ে কেন আপনার আগ্রহ জন্মেছে বিস্তারিত লিখুন।

আগ্রহ

আগ্রহ হল কোন বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেয়ার জন্য এক ধরনের মানসিক প্রস্তুতি। এই প্রস্তুতি এমনি এমনি হয় না। এর জন্য মানুষের ভিতর থেকে তাগিদ থাকতে হয়। এখানে যে বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেয়ার কথা বলা হচ্ছে তাকে উদ্দীপক বলা যায়। যেমন, পাটিগণিত বা বীজগণিতের অংক বা জ্যামিতি। সাধারণত কোন শিক্ষার্থীর শিখনের জন্য আগ্রহ তৈরি করতে হয়। অংকের ক্ষেত্রে যদি আগ্রহ তৈরি করতে হয় তবে তার জন্য শিক্ষার্থীর মানসিক প্রস্তুতি প্রয়োজন। পরীক্ষায় ভাল নম্বর পাওয়ার জন্য প্রথমে শিক্ষার্থী তার ভিতর থেকে অংক করার তাগিদ বা প্রয়োজন অনুভব করে। এজন্য সে অংক করার জন্য নিজেকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করে, অর্থাৎ আগ্রহী হয়।

আগ্রহকে নানাভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়। হার্বার্ট এর মতে, আগ্রহ হলো নতুন কোন জ্ঞান আহরণের জন্য মনের প্রস্তুতি। আবার ডিউইর মতে আগ্রহ হলো, ব্যক্তির নিজের বিকাশ প্রক্রিয়া অভিমুখে তার স্বতঃস্ফূর্ত অগ্রগতি। যেভাবেই সংজ্ঞায়িত করা হোক না কেন আপনার কাছে নিশ্চয়ই এটি স্পষ্ট হয়েছে যে কোন উদ্দীপকের প্রতি আগ্রহী হতে হলে মনকে

বিশেষভাবে তৈরি বা সংগঠিত করতে হয়। এই সংগঠনের নাম হল মানসিক প্রস্তুতি। যেমন, কোন কোন মানুষ আছে যারা রান্নার প্রতি বিশেষ আগ্রহী। অর্থাৎ রান্না কৌশল বা প্রক্রিয়াটি একটি উদ্দীপক এবং এই উদ্দীপকের প্রতি মনোযোগ দেয়ার জন্য তারা নিজেদেরকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করেছেন। এর জন্য তারা যে প্রয়োজন বা তাগিদ অনুভব করেন তা হল উৎকৃষ্ট মানের খাওয়া।

মানুষের বিভিন্ন ধরনের চাহিদার কারণে সে নিজের ভিতরে প্রয়োজন বা তাগিদ অনুভব করে। যেমন, 'উৎকৃষ্ট মানের খাওয়া' একটি জৈবিক চাহিদা। এরকম অন্যান্য চাহিদা হল মানসিক চাহিদা, সামাজিক চাহিদা, কৌতুহলজনিত চাহিদা, সাংস্কৃতিক চাহিদা ইত্যাদি। যে চাহিদার কারণেই আগ্রহ জন্মাক না কেন, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আগ্রহ মানুষের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে।

মনোযোগ

মনোযোগ হল আগ্রহের পরবর্তী ধাপ। কোন উদ্দীপকের প্রতি যদি আগ্রহ থাকে তবে মানুষ তাতে মনোযোগ দেয়। মনোযোগ একটি মানসিক প্রক্রিয়া বিশেষ। আমাদের চতুর্দিকে বহু রকম উদ্দীপক ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এইসব উদ্দীপকের বৈশিষ্ট্য হল এরা প্রত্যেকে তার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দ্বারা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমরা হয়তো বিভিন্ন সময়ে সকলের দিকে দৃষ্টি দিতে পারি, কিন্তু যদি সাড়া দিতে হয় তবে একটির প্রতি সাড়া দিতে হবে। কারণ একসাথে অনেকের প্রতি সাড়া দেয়া কখনও সম্ভব না। সুতরাং মানুষ একটি উদ্দীপককে নির্বাচন করে এবং তার প্রতি সাড়া দেয়। এই নির্বাচন প্রক্রিয়া ও সাড়া দেয়াকে একসাথে মনোযোগ বলে। যেমন, মনে করুন আপনি আপনার ঘরে বসে আছেন। ঘরের মধ্যে বিভিন্ন বস্তু যেমন চেয়ার, টেবিল, আলো, ফ্যান, আলমারী, শিশুর কান্না, রান্নাঘর থেকে ভেসে আসা শব্দ, রান্নার গন্ধ ইত্যাদি সবকিছুই উদ্দীপক। এরা সবাই আপনার মনকে আকর্ষণ করছে। কিন্তু আপনি শিশুর কান্নার প্রতি সাড়া দিলেন। অর্থাৎ তার কান্না থামানোর জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন এবং শিশুর প্রতি মনোযোগ দিলেন। এভাবে বহু উদ্দীপকের মাঝে শিশুর কান্না আপনাকে প্রভাবিত করেছে যার জন্য আপনি তার প্রতি মনোযোগী হয়েছেন। অতএব এ কথা বলা যায় যে, মনোযোগ এক ধরনের মানসিক নির্বাচন প্রক্রিয়া।

মনোযোগ কিসের দ্বারা নির্ধারিত হয়, এ বিষয়টি শিক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের চারপাশে বহু উদ্দীপকের মাঝে মাত্র একটি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়, অন্যান্য উদ্দীপক সমর্থ হয় না। এ কারণকে দুভাবে ব্যাখ্যা করা যায়ঃ

১. অভ্যন্তরীণ নির্ধারক
২. বাহ্যিক নির্ধারক

অভ্যন্তরীণ নির্ধারক

এই ধরনের নির্ধারকগুলো মানুষের মধ্যে থাকে। কোন একটি বিশেষ উদ্দীপকের প্রতি সাড়া দেয়ার জন্য মানুষের মন তৈরি হয়ে থাকে। অর্থাৎ তার প্রতি সে আগ্রহী আছে। যেমন, একজন সঙ্গীতজ্ঞ গানবাজনার প্রতি মনোযোগী হন। আবার একজন শিক্ষাবিদ লেখাপড়ার বিষয়ে মনোযোগী হন। শিক্ষার ক্ষেত্রে কোন বিষয় যেমন, সাহিত্য বা বিজ্ঞান শিক্ষার্থী যেটি পড়ে আনন্দ পায় সেটি শেখার জন্য মনোযোগী হয়। এখানে বিষয়টির প্রতি শিক্ষার্থী প্রথমে আগ্রহী হয়, পরে মনোযোগী হয়।

বাহ্যিক নির্ধারক

এ ধরনের নির্ধারকগুলো উদ্দীপকের মধ্যে থাকে। আমরা উদ্দীপকের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তার প্রতি মনোযোগী হয়ে থাকি। যেমন, একটি কাপড়ের(শাড়ী বা জামা) রং দেখে বা তার ডিজাইন দেখে আপনি সেটির প্রতি মনোযোগী হতে পারেন। আবার অনেক খাদ্যের গন্ধ, বর্ণ ও স্বাদ পরখ করে আমরা তার প্রতি মনোযোগী হই।

আগ্রহ ও মনোযোগের সম্পর্ক

আগ্রহ ও মনোযোগের মধ্যে একটি নিবিড় সম্পর্ক আছে। মনোযোগ হল মনের উদ্দীপক নির্বাচনী প্রক্রিয়া। এর পিছনে আছে ব্যক্তির মানসিক প্রস্তুতি বা আগ্রহ। আগ্রহ মানুষের মধ্যে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে। মানুষ যখন তার আগ্রহের বিষয়টিতে মনোযোগ দেয় তখন তা সক্রিয় হয়ে ওঠে। যেমন, বিজ্ঞান

আগ্রহকে কেন্দ্র করে মনোযোগ সক্রিয় হয়

বিষয়টি পড়ার ইচ্ছা যখন শিক্ষার্থীর মধ্যে কেবল ইচ্ছারূপে থাকে, তখন তাকে আগ্রহ বলা হয়। যখন অনেক বিষয়ের মধ্যে থেকে পড়বে বলে শিক্ষার্থী বিশেষভাবে বিজ্ঞান বিষয়টিকে বেছে নেয় ও পড়ে, তখন সে প্রক্রিয়াকে আমরা মনোযোগ বলি। আগ্রহকে কেন্দ্র করে মনোযোগ সক্রিয় হয়। সুতরাং যা ভিতরে আগ্রহ তা বাইরে মনোযোগ।

ক্যারিয়ার গঠনে আগ্রহ ও মনোযোগের গুরুত্ব

আমরা দেখেছি যে, ব্যক্তির ক্যারিয়ার তার সার্বিক দিক পরিগ্রহ করে গড়ে ওঠে। শুধু সামাজিক দিকই নয়, তার ব্যক্তিগত দিকও ক্যারিয়ার গঠনের অন্যতম উপাদান। ক্যারিয়ার সম্পন্ন একজন ব্যক্তি সমাজে সকলের কাছে সমাদৃত, সকলে তাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে। তিনি সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত। এ কারণে সমাজের বহুবিধ বিষয়ে তার আগ্রহ থাকতে হয়। সমাজে যা কিছু কল্যাণকর, সৃজনশীল, আধুনিক ও ইতিবাচক তার সব বিষয়ে তিনি আগ্রহী থাকবেন এটাই কাম্য।

ক্যারিয়ার গঠনের জন্য ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি কাজকে ফলপ্রসূ করে তুলতে হবে। সেজন্য এসব কাজের প্রতি তার আগ্রহ আছে কিনা তা সর্বাগ্রে দেখতে হবে। প্রকৃতপক্ষে তাকে তার আগ্রহের উপর নির্ভর করে কাজ নির্বাচন করতে হবে এবং সে কাজে মনোযোগী হয়ে তাতে উৎকর্ষ লাভ করতে হবে। সমাজের মঙ্গলজনক কাজের প্রতি বা কর্মক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক কোন কাজের প্রতি নিজেকে আগ্রহী করে তুলতে হলে কাজগুলোকে নিজের পছন্দমতো ও আকর্ষণীয় করে তোলা দরকার। সে জন্য তিনি নিজেই নিজের কাজের অনুকুল পরিবেশ গঠন করতে পারেন। কাজের প্রতি নিজেকে আগ্রহী করার অন্য আর একটি শর্ত হল কাজের চাহিদা অনুভব করা। সামাজিক তথা সার্বিক উন্নয়নে কাজটি কীরূপ ভূমিকা রাখবে বা তার চাহিদা কতটুকু আছে, ব্যক্তি যদি একবার তা অনুভব করেন তবে তিনি কাজটির গুরুত্ব উপলব্ধি করবেন এবং আগ্রহী হবেন। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, কাজে আগ্রহ থাকলে সময় ও পরিবেশ অনুযায়ী তিনি অবশ্যই কাজে মনোযোগ দেবেন।

ক্যারিয়ার গঠনে নিজেকে সার্থক করে তুলতে হলে কাজের প্রতি অনুরাগ তৈরি করতে হয়। অর্থাৎ যেহেতু কাজের প্রতি আগ্রহ আছে বা আকর্ষণ আছে, কাজটি মনোযোগ দিয়ে করতে হবে। দেখা যায়, কাজে যদি আকর্ষণ থাকে তবে কাজটি যতই কঠিন বা কষ্টদায়ক হোক না কেন ব্যক্তি আনন্দের সাথে তা গ্রহণ করে এবং মনোযোগী হয়। সে কারণে কাজের প্রতি আগ্রহ থাকাই বড় কথা। অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন বাহ্যিক, এমনকি অনেকক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ কারণের জন্য কাজে স্বত:স্ফূর্ত মনোযোগ আনা কঠিন হয়ে পড়ে। তখন জোর করে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করতে হয়। বস্তুত: এই ইচ্ছাশক্তির পিছনেও কাজ করে ব্যক্তির আগ্রহ। অর্থাৎ কাজটির চাহিদা যদি তিনি অনুভব করেন তবে আগ্রহী হবেন এবং পরিবেশের অভাবে মনোযোগ দিতে না পারলেও প্রবল ইচ্ছাশক্তি কাজে লাগিয়ে কাজটি তিনি সম্পন্ন করতে পারেন। ক্যারিয়ার গঠনে ব্যক্তিকে এভাবেই আগ্রহ ও মনোযোগকে কাজে লাগিয়ে উদ্দেশ্য অর্জনে সফল হতে হয়।

কাজ - দুই

কাজ এক-এ আগ্রহের বিষয় হিসেবে যেগুলোর নাম লিখেছেন সেগুলোতে কীভাবে মনোযোগ স্থাপন করবেন তা ব্যাখ্যা করুন।

সারসংক্ষেপ

আমাদের চতুর্দিকে অসংখ্য জিনিস বা বিষয় ছড়িয়ে আছে, যার সবকিছুর উপর আমরা প্রতিক্রিয়া করি না বা মনোযোগ দিই না। আমাদের নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী অথবা অভ্যাসবশতঃ আমরা কোন কিছুর উপর মনোযোগ দিই। তবে যে কারণেই আমরা মনোযোগ দিই না কেন মনোযোগের মূলে থাকে বিষয়ের প্রতি আগ্রহ। আগ্রহকে কেন্দ্র করে মনোযোগ সক্রিয় হয়। মনোযোগ দেয়ার জন্য কোন বিষয়ের প্রতি আগ্রহ থাকা বাঞ্ছনীয়। এ কারণে যে বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে বা দেয়া প্রয়োজন সে বিষয়ে আগ্রহ জন্মানোর জন্য বিষয়টিকে মূল্যবান বা গুরুত্বপূর্ণ করে তোলা দরকার। অর্থাৎ বিষয়টির অবস্থান এমন হবে যে ব্যক্তি তার চাহিদা অনুভব করবে। ব্যক্তি যদি চাহিদা অনুভব করে বা গুরুত্বপূর্ণ মনে করে তবে সে তার প্রতি আগ্রহী হবে। তখন সে ঐ বিষয়সংক্রান্ত কাজ নিজ উদ্যোগে মনোযোগ দিয়ে করবে এবং নিজ জীবন বিকাশে সার্থকভাবে এগিয়ে চলবে। এভাবে ব্যক্তির ক্যারিয়ার গঠনে তার আগ্রহ ও মনোযোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.১০

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। আগ্রহ মানুষের কোন বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করে?

ক. চাহিদা
খ. আচরণ
গ. আবেগ
ঘ. প্রয়োজন।

২। প্রাতিষ্ঠানিক কোন কাজে নিজেকে আগ্রহী করে তুলতে আপনি কী করবেন?

ক. কাজে অখণ্ড মনোযোগ দেবেন
খ. কাজের চাহিদা জরিপ করবেন
গ. সময়মতো কাজে হাত দেবেন
ঘ. কাজকে আকর্ষণীয় করে তুলবেন।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। আগ্রহ ও মনোযোগের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন।
২। ক্যারিয়ার গঠনে ব্যক্তির মনোযোগের ভূমিকা আলোচনা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.১০ : ১। ঘ ২। ক

পাঠ-২.১১ মনোযোগের বৈশিষ্ট্য, গুরুত্ব ও মনোযোগ বৃদ্ধির উপায়

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- কীভাবে মনোযোগের কৌশল আয়ত্ব করা সম্ভব তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- নিজের চেষ্টায় কীভাবে মনোযোগ বৃদ্ধি করা যায় তা উল্লেখ করতে পারবেন;
- মনোযোগ বিঘ্নকারী উপাদানসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন।

কোন সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং তা সমাধানের জন্য মনোযোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ অনেক সময় স্বতঃস্ফূর্তভাবে মনোযোগ বৃদ্ধি করার জন্য কিছু কৌশল অবলম্বন করে। নিজেদের স্মৃতিশক্তিকে আরও শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে সে সমাধানের বিষয়গুলোকে সংগঠন করে, মনকে প্রস্তুত করে এবং অনুশীলন করে। এর জন্য মানুষকে বিশেষভাবে কোন শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ দেয়া হয় না বটে, তবে বিষয়ের প্রতি মনোযোগ গঠন ও তা বৃদ্ধি করার জন্য প্রয়োজনীয় ও সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ অত্যন্ত কার্যকরী হয়।

কাজ - এক

এটি একটি যুগল কাজ। আপনার পাশের কোন বন্ধুর সাথে বসে এ কাজটি করতে হবে। এটি সাক্ষাৎকারমূলক কাজ। আপনি আপনার বন্ধুকে প্রশ্ন করবেন পরে আপনার বন্ধুও আপনাকে প্রশ্ন করবেন। নিচে প্রশ্নের কিছু নমুনা দেয়া হল।

১. আপনার আগ্রহ আছে এমন ৩টি বিষয়ের নাম বলুন।
২. এই তিনটি বিষয়কে যদি একসাথে আপনার সামনে উপস্থিত করি তাহলে কোনটি আপনি বেশি পছন্দ করবেন এবং কেন?
৩. অন্য দুটি বিষয়ের প্রতি আপনার মনোভাব কেমন হবে এবং কেন?
৪. প্রথম বিষয়টিকে গ্রহণ করতে গিয়ে যদি অন্য বিষয় দুটি আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করে তাহলে আপনি কি করবেন?
৫. কোন বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেয়ার জন্য আপনি কী করেন?
৬. সাধারণত কখন আপনার মনোযোগ নষ্ট হয়?

মনোযোগের বৈশিষ্ট্য

কোন নির্দিষ্ট একটি উদ্দীপকের প্রতি ইন্দ্রিয় বা ইন্দ্রিয়সমূহকে নিবদ্ধ করাই হল মনোযোগ। মনোযোগ একটি মানসিক ক্রিয়া। এ ক্রিয়ায় ব্যক্তি তার চেতনাকে সরিয়ে নিয়ে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে কেন্দ্রীভূত করে। মনোযোগের কাজ হল বহুসংখ্যক উদ্দীপকের মধ্য থেকে একটি উদ্দীপককে বেছে নেয়া, যেটিকে পরিষ্কারভাবে ও সুস্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করা যায়। গভীর মনোযোগ দেয়ার জন্য একটিমাত্র উদ্দীপকের প্রতি ইন্দ্রিয়কে কেন্দ্রীভূত করতে হয়। আমাদের চারপাশে যে অসংখ্য উদ্দীপক আছে সেগুলোর প্রত্যেকটি এক বা একাধিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু আমাদের কাছে অপ্রয়োজনীয় ও অপ্রাসঙ্গিক উদ্দীপক কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে না। যেমন, আপনি যখন পড়ায় মন দেন, তখন যদি পাশের ঘরে টেলিভিশন চলে, আপনি টেলিভিশনের প্রতি কোন প্রতিক্রিয়া করেন না। কারণ প্রতিক্রিয়া করলে পড়ার উপর মনোযোগ থাকে না। এজন্য টেলিভিশন বা পড়া, মনোযোগ দেয়ার জন্য যে কোন একটিকে বেছে নিতে হয়। আমরা কোন বিষয় বা বস্তুর সমগ্র অংশে বা একটি বিশেষ অংশে মানোযোগ দিতে পারি। আবার বস্তুর কোন বৈশিষ্ট্য যেমন, তার রং, আকার, আকৃতি বা নক্শা ইত্যাদির যে কোন একটির প্রতি মনোযোগ দিতে পারি। তেমনই শব্দের সম্পূর্ণ অংশ বা বিশেষ একটি অংশে যেমন, তীব্রতা, স্বর বা উৎস ইত্যাদি যে কোন একটির প্রতি আমরা মনোযোগ দিতে পারি।

মনোযোগের সময় ইন্দ্রিয়গুলোর সমন্বয় করা দরকার এবং আমাদের পেশীসমূহের সঠিক উপযোজন করা প্রয়োজন। যেমন, আপনি যদি ক্লাসে পিছনের সারিতে বসেন এবং শিক্ষকের কথা স্পষ্ট শুনতে চান, তবে আপনার কানটিকে বিশেষভাবে শিক্ষকের কথার প্রতি নিবিষ্ট করতে হবে। অনেক সময় যে বিষয় বা বস্তুর প্রতি আমরা মনোযোগ দিতে চাই, সেটি ছাড়াও

অন্যান্য উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়ার কারণে আমাদের মনোযোগ নষ্ট হয়ে যায়। যেমন, পাশের ঘরে টেলিভিশনের শব্দ বা কোন সুন্দর দৃশ্য। এ অবস্থায় ইন্দ্রিয়ের দৃঢ় অভিযোজন খুব কার্যকরী হয়। তবে পেশীর উপযোজন অনেকক্ষেত্রে কার্যকরী হয় না। শ্রেণির ভিতরে ছাত্র অনেক সময় শিক্ষকের দিকে তাকিয়ে শ্রেণির বাইরে কোন বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হতে পারে। মনোযোগের কতগুলো বৈশিষ্ট্য আছে। সেগুলো নিম্নরূপঃ

১. মনোযোগের স্থান পরিবর্তন হয়
২. মনোযোগের বিচ্যুতি ঘটে
৩. মনোযোগ বিভক্ত হতে পারে
৪. মনোযোগের একটি পরিসর আছে
৫. মনোযোগের একটি কেন্দ্র ও প্রান্ত আছে।

মনোযোগের স্থান পরিবর্তন হয়ঃ একটি সাদা কাগজের উপরে একটি ক্ষুদ্র কালো বিন্দু আঁকুন। এবার একটু দূর থেকে বিন্দুটিকে দেখার চেষ্টা করুন। দেখবেন বিন্দুটিকে একবার দেখা যাচ্ছে আর একবার দেখা যাচ্ছে না। এর কারণ হল আপনার মনোযোগ কিছুক্ষণের জন্য ঐ বিন্দু থেকে অন্যত্র সরে যাচ্ছে। দেয়ালে ঝোলানো কোন ক্যালেন্ডারের ছবির দিকে তাকালেও দেখবেন ছবির একটি অংশের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে না। অর্থাৎ মনোযোগ ঘন ঘন স্থান পরিবর্তন করে।

মনোযোগের বিচ্যুতি ঘটেঃ মানুষ কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের প্রতি অনেকক্ষণ মনোযোগ ধরে রাখতে পারে না। পড়ার সময় পাশের ঘরে টেলিভিশনের শব্দের প্রতি আপনার মনোযোগ সরে যায়। কিছুক্ষণ পর আপনি আবার তা ফিরিয়ে আনেন, আবার সরে যায়। এমনি করে শুধু টেলিভেশন না, অন্যান্য উদ্দীপক যেমন, কারও কথা বা হাসি ইত্যাদির প্রতিও মনোযোগ সরে যায়। এভাবে বার বার মনোযোগের বিচ্যুতি ঘটে।

মনোযোগ বিভক্ত হতে পারেঃঅনেকে একইসাথে একাধিক বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হতে চেষ্টা করেন। যেমন, একজন গৃহিণী গান শুনতে শুনতে রান্না বা সেলাই করেন। প্রকৃতপক্ষে তার মনোযোগ ক্ষণিকের জন্য গানে এবং ক্ষণিকের জন্য রান্নায় নিবদ্ধ থাকে। কোন কোন ব্যক্তির মনোযোগকে এভাবে বিভক্ত করার ক্ষমতা বেশি থাকে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ ধরনের বিভক্ত মনোযোগ নিয়ে কোন কাজ সুষ্ঠুভাবে করা যায় না।

মনোযোগের একটি পরিসর আছেঃ ব্যক্তি একসাথে কতগুলো উদ্দীপকের প্রতি মনোযোগ দিতে পারে তাই হল তার মনোযোগের পরিসর। মনে করেন, ব্যাংকের একজন ক্যাশিয়ার বসে টাকা গুনছেন, তার সামনে যে লোকটি দাঁড়িয়ে আছে তাকে তিনি চেনেন কিনা তা লক্ষ করছেন, পাশে অন্য একজন কর্মকর্তার কথা শুনছেন। সবগুলো কাজই যদি তিনি সুষ্ঠুভাবে করতে পারেন, তবে বুঝতে হবে তার মনোযোগের পরিসর এই তিন দিক।

মনোযোগের একটি কেন্দ্র ও প্রান্ত আছেঃ মনে করুন আপনি একটি বই পড়ছেন। বইয়ের ভিতরে লেখার প্রতি আপনার দৃষ্টি নিবদ্ধ। এটি স্পষ্টভাবে আপনার চেতনায় আছে। অর্থাৎ আপনার মনোযোগের কেন্দ্র হল বইয়ের লেখা। বই এবং বইয়ের একান্ত কাছে যেসব জিনিস ছড়িয়ে আছে সেগুলোও আপনার দৃষ্টির মধ্যে আছে। এগুলো অস্পষ্টভাবে আপনার চেতনায় আছে। এটি হল মনোযোগের প্রান্ত। কিন্তু বই থেকে বেশ একটু দূরে যেসব জিনিস আছে সেগুলো আপনি দেখতে পাচ্ছেন না। সেগুলো সম্পর্কে সচেতন থাকা সম্ভব না।

মনোযোগ বৃদ্ধির উপায়

আমাদের চতুর্দিকে শত শত উদ্দীপক আমাদের অনুভূতিকে নাড়া দেয়। যেমন, চারপাশের মানুষজন, তাদের কণ্ঠস্বর, আলো, শব্দ, তাপমাত্রা, ঘরের বিভিন্ন রকম জিনিসপত্র, বা কর্মস্থানের বিভিন্ন জিনিস, ফাইলপত্র, কলম, বাইরের দৃশ্যাবলি ইত্যাদি। আপনি যদি দেখেন ঘরে বা বিশেষ করে কর্মস্থানের যে কোন কাজে আপনি মনোযোগ দিতে পারছেন না, তবে বিভিন্নভাবে আপনার মনোযোগ সৃষ্টি করার জন্য চেষ্টা করতে পারেন।

প্রথমতঃ যে বিষয় নিয়ে আপনি কাজ করছেন যেমন, কাগজ কলম বা কম্পিউটার, ফাইলপত্র বা ঘরের বইপুস্তক ইত্যাদি যাই হোক না কেন বিষয়টির উপর আপনাকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। অর্থাৎ ভালোভাবে তাকাতে হবে।

দ্বিতীয়ত: কাজের নির্দিষ্ট স্থানে বিষয়টিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। অর্থাৎ বিষয়টিতে কোন জটিলতা আছে কিনা তা ভালোভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখতে হবে। জটিলতা থাকলে জটিল স্থানটি কোথায় বা কী তা খুঁজে বের করতে হবে। আর কাজটি যদি সহজ হয় তবে মনোযোগ আনার জন্য বিষয়টি উচ্চারণ করে পড়তে পারেন বা বিষয়টির প্রতি মৃদু শব্দ করতে পারেন।

তৃতীয়ত: এবার কাজটি বা সমস্যাটি সমাধান করার উদ্দেশ্যে বিষয়ের প্রতি সম্পূর্ণ মনকে আবদ্ধ করতে হবে। আমরা জানি মনকে এভাবে আবদ্ধ করাই মূলত: কঠিন কাজ। কিন্তু কাজটি সমাধানের জন্য আপনাকে ইচ্ছা তৈরি করতে হবে। এই ইচ্ছাই আপনাকে মন আবদ্ধ করতে সাহায্য করবে।

চতুর্থত: কাজের নির্দিষ্ট স্থান ছাড়া চারপাশে আর যেসব উপাদান বা উদ্দীপক আছে, তাদের সম্পূর্ণ অবহেলা করুন। এখানে অবহেলা বলতে বোঝানো হয়েছে উদ্দীপকগুলোর উপস্থিতি ও অবস্থান সম্পূর্ণ ভুলে যান। আপনার মনে শুধুই বিষয়ের সমস্যাজনিত স্থানটি থাকবে।

যখন দেখবেন, আপনি বিষয়ের সমস্যাটি বুঝতে পারছেন এবং কাজটি অবলীলায় করতে পারছেন তখনই বুঝতে হবে আপনার মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হয়েছে। অপ্রাসঙ্গিক সকল বিষয় ছাড়া মূল বিষয়ে আপনার মনোযোগ তৈরি হয়েছে। মনোযোগ বসানোর এই পদ্ধতিটি যদি একবার আপনার আয়ত্বে এসে যায় তবে পরবর্তীতে আপনি মনোযোগ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি করতে পারবেন। আপনি মনোযোগ বসানোর এই প্রক্রিয়া যত বেশি বাড়াতে পারবেন অর্থাৎ বেশিক্ষণ যদি মনোযোগ ধরে রাখতে পারেন, আপনার দ্বারা সম্পাদিত কাজের পরিমাণ তত বেশি বেড়ে যাবে।

সাধারণভাবে মনোযোগ বৃদ্ধি করতে না পারার কারণ হল মনোযোগ নষ্ট হওয়া বা বিছিন্ন হওয়া। এক্ষেত্রে আপনি অবশ্যই চাইবেন আপনার মনোযোগ যেন কোন প্রকারেই নষ্ট না হয়। সেজন্য নিচের কয়েকটি বিষয়ে আপনাকে সচেতন থাকতে হবে। বিষয়গুলো হল:

মনোযোগের বিকর্ষক: কিছু কিছু কারণ থাকে যার জন্য মনোযোগ নষ্ট হয়ে যায় যেমন, বিশেষ কোন সমস্যা বা দুশ্চিন্তা বা বিশেষ কোন কিছুর প্রতি আকর্ষণ ইত্যাদিকে মনোযোগের বিকর্ষক বলা হয়। প্রয়োজন হলে বিকর্ষককে আপনার কাজের স্থান বা পরিবেশ থেকে দূরে সরিয়ে রাখবেন। আর যদি দূরে সরাতে না পারেন তবে সেই বিকর্ষকের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। যেমন, কাছেই কোথাও হাতুড়ি পেটানোর শব্দ, পাশের বাড়ির শিশুর কান্না ইত্যাদি। অন্যদিকে দুশ্চিন্তা বা অমীমাংসিত সমস্যা মনোযোগ বিকর্ষণের একটি অন্যতম কারণ। এ কারণে প্রাপ্তবয়স্কদের পক্ষে কোন বিষয়ে মনোযোগ দেয়া শক্ত কাজ। এক্ষেত্রে বিকর্ষণকারী সমস্যার একটি সাময়িক সমাধান আগেই করে রাখা ভালো।

আবার অতৃপ্ত বাসনা বা ইচ্ছা মনোযোগের এক ধরনের বিকর্ষক। যেমন, কাজ নিয়ে বসলেই কোথাও যেতে ইচ্ছে করে বা গল্প করতে ইচ্ছে করে ইত্যাদি। এ ধরনের ইচ্ছাও মনোযোগের বিকর্ষক। এক্ষেত্রে মনকে আগে বোঝাতে হবে কোনটির চাহিদা এবং মূল্য আপনার কাছে বেশি। যেটি গুরুত্বপূর্ণ সেটির চাহিদা আগে মিটিয়ে নিতে হবে, পরে অন্য কাজটি করা সম্ভব হবে।

প্রেষণাবোধ: যে বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে তার প্রতি আন্তরিক আগ্রহ না থাকলে মনোযোগ আসতে পারে না। সাধারণত দেখা যায় ব্যক্তির প্রকৃত চাহিদার সঙ্গে মনোযোগের বিষয়ের কোন প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ থাকে না। তখন মনোযোগ দেয়া অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। বিশেষ করে চাকরি বা বৃত্তি অনুসরণের ক্ষেত্রে অনেক সময় ভুল বা অপ্রীতিকর বৃত্তি নির্বাচন করার জন্য মন দিয়ে কাজ করা সম্ভব হয় না। এ জন্য চাহিদা, সামর্থ্য ও আগ্রহ অনুসারে বৃত্তি নির্বাচন করা উচিৎ। তবে নেহায়েতই বাধ্য হয়ে অপছন্দনীয় কোন বৃত্তি যদি নির্বাচন করেন এবং তা পরিবর্তন করা সম্ভব না হয় তবে সে চাকরিকে আপনার চাহিদার অন্তর্ভুক্ত করে নিতে হবে। তখন মনোযোগ দিতে আর অসুবিধা হবে না। এক্ষেত্রেও মনকে বোঝাতে হবে এবং মানসিক স্থিতি আনতে হবে।

মনোযোগ বৃদ্ধি করার একটি ভালো উপায় হল কাজের পরিকল্পনা করা এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করা। পরিকল্পনা করলে নির্ধারিত কাজ করার জন্য মন পূর্ব থেকেই প্রস্তুতি গ্রহণ করে। কীভাবে কাজটি ভালোভাবে সম্পন্ন করা যায় সেজন্য ব্যক্তি চিন্তা করতে থাকে এবং সচেষ্ট হয়। যার কাজে যত ভালো পরিকল্পনা ও শৃঙ্খলা আছে তার পক্ষে কাজে মনোযোগ দেয়া তত সহজ।

কাজ - দুই

আপনার পছন্দ বা আগ্রহ আছে এমন একটি বিষয়ে মনোযোগ বৃদ্ধি করার জন্য সময় ও কর্মকৌশল সম্বন্ধে একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করুন।

সারসংক্ষেপ

মনোযোগ হচ্ছে এক ধরনের মানসিক বৌদ্ধিক প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় অসংখ্য উদ্দীপকের মধ্য থেকে মন একটিকে বেছে নেয় এবং আমাদের চেতনা তার প্রতি কেন্দ্রীভূত হয়। সুতরাং মনোযোগ দেয়ার সময় মন থাকে সক্রিয়। এর ফলে মনোযোগের বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ হয়। মনোযোগের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল একই সাথে একের অধিক বিষয়ে মনোযোগ দেয়া সম্ভব না এবং মনোযোগ বার বার স্থান পরিবর্তন করে ও তার বিচ্যুতি ঘটে। দৈনন্দিন জীবনে আমাদের একই সাথে একের অধিক বিষয়ে মনোযোগ দেয়ার প্রয়োজন হতে পারে। সে ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে আমাদের ইন্দ্রিয় যেখানে কেন্দ্রীভূত হয় সেটাই মনোযোগের প্রকৃত স্থান, অন্য আর যা আছে তা চেতনায় থাকে মাত্র। অন্যদিকে মনোযোগ বিকর্ষণের জন্য পরিবেশের নানারকম উপাদান কাজ করে। মানুষ তার ইচ্ছা ক্ষমতা ব্যবহার করে মনোযোগ বৃদ্ধি করার জন্য বিকর্ষণের এসব উপাদান দূর করতে পারে। সর্বোপরি মনোযোগ বৃদ্ধি করা এবং তা কার্যকরী করার জন্য কর্ম পরিকল্পনা একটি বিশেষ উপযোগী ব্যবস্থা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.১১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। একইসাথে বিভিন্ন বিষয়ে মনোযোগ দেয়ার ক্ষমতাকে কি বলা হয়?

ক. পরিসর
খ. বিচ্যুতি
গ. স্থান
ঘ. বিভক্তি।

২। কোন বিষয়ের প্রতি মনোযোগ বৃদ্ধি করতে হলে কোনটি প্রয়োজন?

ক. মনকে বিষয়ের প্রতি নিবদ্ধ করা
খ. চেতনাকে সক্রিয় করা
গ. বিষয়ের প্রতি আন্তরিক আগ্রহ থাকা
ঘ. মানসিক চাহিদাকে মূল্য দেয়া।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। 'অনেক সময় শ্রেণীর ভিতরে বসে শিক্ষার্থী বাইরের ব্যাপারেও মনোযোগী হতে পারে' মনোযোগের বৈশিষ্ট্যের আলোকে বক্তব্যটি ব্যাখ্যা করুন।

২। মনোযোগ বৃদ্ধি করার উপায় আলোচনা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.১১ : ১। ঘ ২। ক

পাঠ-২.১২ আবেগ, আবেগের প্রকারভেদ এবং আবেগের প্রভাব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- আবেগ বলতে কী বোঝায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- আবেগের শ্রেণীভাগ করতে পারবেন।
- ব্যক্তির আচরণে আবেগের প্রভাব চিহ্নিত করতে পারবেন।

মানুষের জীবনের সাথে আবেগ ঘনিষ্টভাবে যুক্ত। মানুষের আচরণের উপর আবেগের প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক ও গভীর। মানুষ যুক্তিবাদী প্রাণী। তার আচরণ যুক্তি, বুদ্ধি ও বিবেচনা নির্ভর। তা সত্ত্বেও মানুষের অধিকাংশ আচরণ তার আবেগ দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। মানুষকে ভালভাবে বুঝতে হলে তার আবেগকে বুঝতে হবে। আবেগ কী, আবেগের প্রকৃতি, বিভিন্ন আবেগের কাজ, মানুষের আচরণে আবেগের প্রভাব ইত্যাদি না জানলে মানুষকে বোঝা সহজ হয় না। মানুষের আবেগিক বিকাশের উপর তার ব্যক্তিত্ব নির্ভর করে। সুষ্ঠু জীবন যাপন করতে হলে আবেগের সঠিক বিকাশ ও প্রকাশের প্রয়োজন আছে। আবেগিক বিকাশ সুষ্ঠু না হলে আবেগিক আচরণও সুন্দর, সংযত ও সমাজসম্মত হয় না। আবেগিক বিকাশ সুষ্ঠু না হলে ব্যক্তির জীবনে অনেক আবেগিক সমস্যা ও অপসঙ্গতি দেখা যায়।

কাজ - এক

নিচের এ কাজটি কমপক্ষে ৭ দিন ধরে করতে থাকুন।

সময় করে আপনার সন্তান বা আপনার ছোট ভাই বা বোন বা পরিবারের কোন ছোট সদস্যকে (যে স্কুলে পড়ে) তার লেখাপড়ার ব্যাপারে সাহায্য করতে বসুন। এক থেকে দেড় ঘণ্টা ধরে তাকে পড়াতে থাকুন। আপনার শিক্ষার্থীর মনোযোগ, মনোযোগের অভাব, অস্থিরতা, ভুল উত্তর দেয়া বা সঠিক উত্তর দেয়া ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের ফলে আপনার আবেগতাড়িত আচরণ (ধৈর্যচ্যুতি বা ধৈর্যরক্ষা) কিরূপ হয় তা লক্ষ করুন এবং প্রতিটি আচরণের জন্য কোন ধরনের আবেগ কাজ করছে তা লিখুন।

আবেগ

কোন কোন উদ্দীপকের প্রতি সাড়া দেয়ার ফলে আমাদের দেহমনে বিশেষ প্রতিক্রিয়া ও আলোড়নের সৃষ্টি হয়। এই প্রতিক্রিয়ার ফলে আমরা কান্না, হাসি, দুঃখ, রাগ ইত্যাদি বিভিন্ন রকম অভিজ্ঞতা অনুভব করি এবং প্রকাশ করি। আবেগের সম্পর্ক মনের এই বিশেষ অবস্থার সাথে। আবেগ মনের একটি বিচলিত অবস্থা। মনোবিজ্ঞানীরা আবেগের সংজ্ঞা দিতে নানা রকম মত পোষণ করেন। ক্ল্যাপারীড বলছেন, ”আবেগের মনস্তত্ত্ব মনোবিদ্যার এক জটিল বিষয়।” আবেগ আমাদের অনুভূতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিন্তু শারীরিক বহিঃপ্রকাশের মাধ্যমে আমরা আবেগ প্রকাশ করি। ইংরেজিতে আবেগকে emotion বলা হয়। ল্যাটিন শব্দ ইমোভার থেকে (emovere) emotion শব্দের উদ্ভব। এর অর্থ হল প্রক্ষুদ্ধ বা উত্তেজিত হওয়া। তাই বলা যায় আবেগ হল মনের সেই স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশমান অবস্থা যা ব্যক্তিকে দৈহিক ও মানসিক দিক থেকে বিচলিত করে।

আবেগের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল উত্তেজিত হওয়া। যে কোন আবেগঘন পরিস্থিতিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা তার তিনটি দিক দেখতে পাই।

১. বাহ্যিক আচরণ
২. অভ্যন্তরীণ আচরণ
৩. আবেগমূলক অনুভূতি বা সচেতনা।

বাহ্যিক আচরণ: কোন আবেগের প্রভাবাধীন হলে প্রত্যেক প্রাণী কতগুলো বাহ্যিক আচরণ সম্পন্ন করে। যেমন, ভয় পেলে মানুষ পালায়, রাগ করলে হাত পা ছোঁড়ে বা আক্রমণ করে ইত্যাদি। এই আচরণগুলোর একটি সাধারণ লক্ষণ হল যে এগুলো সংহতিনাশক। অর্থাৎ প্রাণী যখন আবেগের বশবর্তী হয়ে কোন আচরণ করে তখন তার স্বাভাবিক অবস্থার সংহতি নষ্ট হয়ে যায়।

অভ্যন্তরীণ আচরণ: শরীরতত্ত্বের দিক থেকে আবেগ কতগুলো দৈহিক পরিবর্তনের সমষ্টি। এই দৈহিক পরিবর্তন নানা রকম হতে পারে, যেমন, রক্ত চলাচলঘটিত, গ্রন্থিঘটিত, স্নায়ুঘটিত, পেশীঘটিত ইত্যাদি।

আবেগমূলক অনুভূতি বা সচেতনতা: প্রাণীর মধ্যে আবেগ জাগলে সুখকর বা দুঃখকর যেমনই হোক একটি অনুভূতি থাকবেই। আবেগ অনুভূতিজাত। অনুভূতি যখন প্রবল হয়ে দৈহিক পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে প্রকাশিত হয় তখনই সেটিকে আবেগ বলে।

আনন্দ, বিরক্তি ইত্যাদি দ্বারা আমরা যে উত্তেজিত বা বিচলিত অবস্থাকে বুঝি তাকে আবেগ বলি। আবেগের মানসিক দিক হল অনুভূতি। আর শারীরিক দিক হল নানারকম শারীরিক পরিবর্তন। দেখা যায় আবেগ হল শারীরিক ও মানসিক প্রতিক্রিয়ার সংমিশ্রণ।

আবেগের প্রকারভেদ

আমাদের বয়স যত বাড়তে থাকে আবেগও তত জটিল হতে থাকে। আবেগমূলক যত আচরণ আছে সেগুলো অনেক সময় পৃথক করা হয় আবার অনেক সময় একত্রিত করে একাধিক আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে ম্যাগডুগালের মত অনেকটা বিজ্ঞানসম্মত। তিনি মানুষের আবেগকে তিন ভাগে ভাগ করেছেনঃ

১. প্রাথমিক বা মৌলিক আবেগ
২. জটিল আবেগ
৩. অর্জিত আবেগ

১. **প্রাথমিক বা মৌলিক আবেগ:** সহজাতভাবে যেসব আবেগ নিয়ে মানুষ জন্মগ্রহণ করে তাকে মৌলিক আবেগ বলা হয়। ওয়াটসন এর মতে মানুষের মৌলিক আবেগ তিনটি। যথা: ভয়, ক্রোধ এবং ভালবাসা। সব প্রবৃত্তিরই একটি অনুভূতিমূলক দিক আছে। এই দিকই প্রবৃত্তিমূলক আচরণের রূপ ঠিক করে। ম্যাগডুগালের মতে প্রবৃত্তির মত মৌলিক আবেগও চৌদ্দটি। এই চৌদ্দটি আবেগ হল ভয়, ক্রোধ, বিরক্তি, স্নেহানুভূতি, কাম, বিস্ময়, হীনমন্যতা, আত্মগৌরব, একাকীত্ববোধ, স্বাধীকারবোধ, সৃজনী স্পৃহা, আমোদ, ক্ষুধা ও দুস্থভাব। অনেক মৌলিক আবেগ জন্মের সময় থাকে না। বয়স বাড়ার সাথে সাথে ধীরে ধীরে প্রকাশ পায়।
২. **জটিল আবেগ:** অনেক সময় আমাদের দুটোর বেশি প্রবৃত্তি একসঙ্গে জাগে। ফলে প্রথমিক আবেগগুলো মিলেমিশে একটি মিশ্র অনুভূতি সৃষ্টি হয়। দুটো বা তার বেশি আবেগ একত্র হয়ে যে মিশ্র আবেগমূলক অবস্থা সৃষ্টি করে ম্যাগডুগাল তাকে মিশ্র বা জটিল আবেগ বলেছেন। যেমন, ম্যাগডুগালের মতে কৃতজ্ঞতা হল মমতা ও হীনমন্যতার মিশ্রণ, লজ্জা হল হীনমন্যতা ও আত্মগরিমার মিলিত রূপ, ঘৃণা হল ক্রোধ, বিরক্তি ও ভয়ের মিশ্রণ, প্রশংসা হল বিস্ময় ও হীনমন্যতার মিশ্রণ ইত্যাদি।
৩. **অর্জিত আবেগ:** প্রাথমিক ও জটিল আবেগ ছাড়া ম্যাগডুগাল অন্য আর এক ধরনের আবেগের কথা বলেছেন। সেটি হল অর্জিত আবেগ। বিবাদ, উল্লাস, আশা, আশঙ্কা ইত্যাদি হল অর্জিত আবেগ।

ম্যাগডুগালের এই শ্রেণিবিন্যাস বেশ সন্তোষজনক ও পূর্ণাঙ্গ। বর্তমানে এ শ্রেণিবিন্যাস অনেক জায়গায় অনুসরণ করা হয়ে থাকে। তবে এর সমালোচনাও আছে। জটিল আবেগ যে একাধিক আবেগের মিশ্রণ তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সবক্ষেত্রে ম্যাগডুগালের বিশ্লেষণ গ্রহণযোগ্য না। পরিণত ব্যক্তির ক্ষেত্রে সব আবেগই মিশ্রধর্মী।

আবেগের প্রভাব

যখন কোন ব্যক্তি আবেগ দ্বারা প্রভাবিত হয় তখন সে দেহমনে উত্তেজিত অবস্থায় থাকে। তার স্বাভাবিক সাম্যাবস্থা নষ্ট হয়ে যায়। আবেগের সময় নানারকম অন্তর্দৈহিক পরিবর্তন দেখা যায়। প্রত্যেক আবেগের একটি নিজস্ব প্রকাশভঙ্গি অছে।

আবেগের প্রভাবে দেহমনের যে পরিবর্তন ঘটে তাকে আমরা দুভাগে ভাগ করতে পারি। তারমধ্যে একটি হল বাহ্যিক আচরণের পরিবর্তন এবং অন্যটি হল দেহযন্ত্রের অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন।

আচরণের বাহ্যিক পরিবর্তন

আমরা স্বাভাবিকভাবে যে সব আচরণ করে থাকি আবেগের সময় সেগুলোর অনেক পরিবর্তন হয়। সেগুলোকে আবেগকালীন আচরণ বলা যেতে পারে। সাধারণত আবেগের সময় বাহ্যিক আচরণের যে পরিবর্তন হয় সেগুলো হল:

- **মুখভঙ্গির পরিবর্তন:** মুখকে মনের আয়না বলা হয়ে থাকে। মনের অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে মুখের ভাব ও ভঙ্গির পরিবর্তন হয়। বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে মানসিক অবস্থা মুখে প্রতিফলিত হয়। যেমন, অত্যাধিক ক্রোধে মুখের বর্ণেরও পরিবর্তন হয়।
- **অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ব্যবহারে পরিবর্তন:** আবেগের সময় বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নাড়াচাড়া সাধারণ নিয়মে হয় না। রাগের সময় আমরা জোরে হাতপা নাড়াচাড়া করি। আবার যখন দুঃখ পাই তখন চুপ করে একা বসে থাকি।
- **গলার স্বর বা কণ্ঠের পরিবর্তন:** বিভিন্ন আবেগে গলার স্বরে বিভিন্ন রকম পরিবর্তন হয়। ভয়, আনন্দ, বিস্ময় ইত্যাদি আবেগে বিভিন্ন রকম ধ্বনি হয়। কণ্ঠস্বরে ব্যক্তি বিস্মিত না আনন্দিত না দুঃখিত হয়েছে তা সাধারণভাবেই বোঝা যায়।
- **চোখের তারার পরিবর্তন:** আবেগের সঙ্গে চোখের সম্পর্ক নিবিড়। আবেগের সাথে সাথে চোখের তারা কখনও বড় বা কখনও ছোট হয়। যেমন, বিস্ময়ে আমাদের চোখ বড় হয়ে যায়।

আচরণের অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন

আবেগের সময় দেহযন্ত্রের অভ্যন্তরে অনেক পরিবর্তন হয়।

- **হৃদযন্ত্রের স্পন্দনের পরিবর্তন:** সুস্থ অবস্থায় মানুষের দেহে যে হৃদস্পন্দন মিনিটে ৮৪ বার হয়, বিশেষ আবেগের সময় তা বেড়ে মিনিটে ১০৪ বারে দাঁড়াতে পারে।
- হৃদস্পন্দন বাড়ার সাথে সাথে রক্তের চাপও বেড়ে যায়। আমরা দেখেছি অত্যাধিক ক্রোধে রক্তচাপ বেড়ে যায়।
- নাড়ীর গতির হারেও পরিবর্তন হয়। ভয়ে কারও কারও নাড়ীর গতি খুব দ্রুত হয় আবার অনেক সময় নাড়ীর বেগ কমে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়।
- রক্ত সঞ্চালনের পরিমাণ বৃদ্ধি, ত্বকের পরিবহন ক্ষমতার পার্থক্য, মস্তিষ্কের কাজের পার্থক্য, শ্বাসকার্যের পরিবর্তন ইত্যাদি আবেগের সময়ে উল্লেখযোগ্য দেহাভ্যন্তরীণ যান্ত্রিক পরিবর্তন। দেহের অভ্যন্তরে এসব পরিবর্তন সংঘটিত হয় স্নায়ুতন্ত্রের পরিবর্তনের কারণে।

আবেগের প্রভাবে শারীরিক পরিবর্তন অপরিহার্য। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গেও পরিবর্তন ও দেহযন্ত্রের পরিবর্তন ব্যতীত আবেগ প্রকাশিত হতে পারে না।

কাজ - দুই

আপনার পারিপার্শ্বিক জগৎ থেকে দুজন ঘনিষ্ট ব্যক্তিকে (স্ত্রী বা পুরুষ) নির্বাচন করুন। বিভিন্ন সময় তাদের আবেগের বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করুন ও লিখুন। এ আবেগ তাদের আচরণকে কীভাবে প্রভাবিত করে বিস্তারিত লিখুন।

সারসংক্ষেপ

আবেগের সময় দেহের ভিতরে বাইরে নানা রকমের পরিবর্তন হয়। আবেগের মাত্রার উপর প্রকাশের এই ভঙ্গি নির্ভর করে। মুখের ভঙ্গিতে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ব্যবহারে, কণ্ঠস্বরে, চোখের তারার পরিবর্তনে বাহ্যিক পরিবর্তন প্রকাশ পায়। হৃদস্পন্দন, নাড়ীর বেগ, রক্ত সঞ্চালন ইত্যাদির মাধ্যমে দেহের ভিতরের পরিবর্তন প্রকাশ পায়। শারীরিক পরিবর্তন আবেগের অপরিহার্য প্রভাব। মনোবিজ্ঞানীরা আবেগের বিভিন্ন শ্রেণীকরণ করেছেন। ওয়াটসন ভয়, রাগ, ভালবাসা এই তিনটি

মৌলিক আবেগের কথা বলেছেন। ম্যাগডুগাল মৌলিক, জটিল ও অর্জিত এই তিনভাগে আবেহকে ভাগ করেছেন। এটাই সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য শ্রেণীকরণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.১২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। আমরা আবেগ প্রকাশ করি কিসের মাধ্যমে?

ক. শারীরিক বহিঃপ্রকাশ
খ. আমাদের কথাবার্তা
গ. শারীরিক অঙ্গভঙ্গি
ঘ. জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা।

২। হৃদস্পন্দন বৃদ্ধির সাথে সাথে কোনটির পরিবর্তন হয়?

ক. মুখভঙ্গি
খ. অঙ্গ প্রত্যঙ্গ
গ. অনুভূতি
ঘ. রক্তের চাপ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। আবেগের ধারণাটি ব্যাখ্যা করুন।

২। আবেগ মানুষের আচরণকে কীভাবে প্রভাবিত করে আলোচনা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.১২ : ১। ক ২। ঘ

পাঠ-২.১৩ ক্যারিয়ার গঠনে ইতিবাচক আবেগ ও চাপ নিয়ন্ত্রণের কৌশল

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ইতিবাচক আবেগ বলতে কী বোঝায় তা বলতে পারবেন।
- ক্যারিয়ার গঠনে ইতিবাচক আবেগ প্রয়োগ করতে পারবেন।
- ক্যারিয়ার গঠনে মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন।

ক্যারিয়ার গঠনে ব্যক্তিকে জীবন পরিচালনায় ইতিবাচক আবেগগুলোর চর্চা করতে হয় এবং তার উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা করতে হয়। ক্ষতিকর আবেগের প্রভাব কমিয়ে ভাল আবেগের উন্নয়ন ঘটালেই ব্যক্তিসত্তার সুষম বিকাশ হবে। পারস্পারিক শ্রদ্ধা ও ভালবাসার মাধ্যমে সবকিছুর মধ্যে আনন্দ খুঁজে পাওয়ার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে। সুন্দরের প্রতি আসক্তি, মহত্তের প্রতি শ্রদ্ধা, দুস্থের প্রতি সহমর্মিতা এসবই শিক্ষার মাধ্যমে গড়ে ওঠে। পারিপার্শ্বিক সুস্থ অবস্থা যেমনঃ ভালবাসা, নিরাপত্তা ইত্যাদি ব্যক্তির ভিতরে ইতিবাচক আবেগের প্রভাব ফেলে। এর ফলে তার ভিতর শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক আবেগের বিকাশ ঘটে। সুতরাং সুস্থ পরিবারিক ও সামাজিক পরিবেশ গড়ে তুলতে সে সক্ষম হয়।

কাজ - এক

নিচের তালিকা থেকে একজন ক্যারিয়ারসম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য প্রয়োজনীয় ভাবমুর্তি গঠনের উদ্দেশ্যে আপনার আবেগকালীন আচরণ চিহ্নিত করুন।

ক্রোধ বিনয় সাহস ভয় বিস্ময় হাসি আনন্দ প্রফুল্ল
প্রশান্ত রাগ বিচলিত আশান্বিত উত্তেজিত বিমর্ষ
প্রেম কান্না হীনমন্যতা আত্মগৌরব সৃষ্টিশীলতা
একাকীত্ববোধ বিরক্তি ক্ষুধাতৃষ্ণা কাম

ক্যারিয়ার গঠনে ইতিবাচক আবেগ

মানুষের জীবনে আবেগ একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। আবেগ ব্যক্তির এমন এক অবস্থা যা তার আচরণকে প্রভাবিত করে। অর্থাৎ ব্যক্তির আচরণ আবেগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। আবেগ সব সময়ই কোন না কোন দৈহিক আচরণের সঙ্গে যুক্ত থাকে। যেমন, খুশীতে মানুষ হাসে। এখানে হাসা আচরণটি খুশীর আবেগের সঙ্গে যুক্ত। এটি একটি ইতিবাচক আবেগ। এ ধরনের আরও আবেগ হল আনন্দিত হওয়া, উৎফুল্ল হওয়া, ভাল কোন বিষয়ের প্রতি অনুরাগী হওয়া, আশা পূরণে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা, ভাল কোন সংবাদে অভিভূত হওয়া ইত্যাদি। আমরা জানি মানুষের আবেগ সৃষ্টির জন্য উদ্দীপক বিশেষ ভূমিকা রাখে। আশা পূরণ, ভাল সংবাদ, সুন্দর কোন দৃশ্য ইত্যাদি হল উদ্দীপক। ব্যক্তি এসব উদ্দীপকের প্রতি প্রতিক্রিয়া করে এবং ইতিবাচক আবেগ প্রকাশ করে।

ক্যারিয়ার গঠনের জন্য মানুষকে বিচিত্র পরিবেশের মধ্য দিয়ে চলতে হয়। কখনও তার আশা পূরণের জন্য সংগ্রাম করতে হয়। এ সংগ্রামে তাকে নানা প্রতিকূলতা অতিক্রম করতে হয়। এ সময় মানুষ অনেক দুঃখ পায়, হতাশ হয়, বিরক্ত হয়, দীর্ঘদিন ধরে তাকে বিষাদময় জীবন যাপন করতে হয়। ক্যারিয়ার গঠনের জন্য মানুষকে প্রচুর উৎকণ্ঠা নিয়ে পথ চলতে হয়। এ সময় নেতিবাচক উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়ায় মানুষের ভিতরে যে আবেগ সৃষ্টি হয় তা তাকে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন করে। নেতিবাচক এসব আবেগের অভিজ্ঞতায় সে দুরকমভাবে প্রতিক্রিয়া করতে পারে। সে হতাশ হয়ে পিছিয়ে যেতে পারে

অথবা নতুন আশায় উদ্যোমী হয়ে উঠতে পারে। নতুনভাবে উদ্যোমী হওয়া ক্যারিয়ার গঠনের জন্য ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। অর্থাৎ হতাশ হয়ে পিছিয়ে যাওয়া ক্যারিয়ার গঠনের জন্য অনুকূল নয়। তবে অনেকদিন ধরে তার ভিতর হতাশা বিরাজ করলে তা ক্যারিয়ার গঠনের জন্য হুমকিস্বরূপ। সে জন্য মানুষকে ছোটখাট খুশীর অনুভূতিতে সাড়া দিতে হয় এবং আনন্দিত হতে হয়। অর্থাৎ বৃহত্তর কল্যাণের উদ্দেশ্যে পথ চলতে হলে মনকে দুঃখে বা হতাশায় নিমজ্জিত করে রাখলে চলবে না। বরং দৈনন্দিন জীবনে যত ছোট প্রাপ্তিই ঘটুক না কেন তাতে খুশী থাকতে হবে এবং নিজের চারপাশের জগতকে হাসি আনন্দে ভরে তুলতে হবে।

ক্যারিয়ার গঠনের জন্য ব্যক্তিকে প্রতিযোগিতায় বসতে হয়। এ অবস্থায় সে দারুন উৎকণ্ঠায় সময় কাটায়। এ উৎকণ্ঠা তাকে মানসিকভাবে বিধ্বস্ত করে রাখে। এর ফলে দৈনন্দিন জীবন দুর্বিসহ হয়ে ওঠে। সে কারণে জীবনে প্রশান্তি আনতে মানুষকে সুখকর কোন উদ্দীপকের অনুসন্ধান করতে হয়। এ উদ্দেশ্যে সে বই পড়ে, সিনেমা দেখে, আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুর সাথে ভাব বিনিময় করে বা সুন্দর কোন জায়গায় বেড়াতে যায়। এর ফলে মনে সুখকর অনুভূতি হয় এবং ইতিবাচক আবেগ তাকে প্রভাবিত করে। ইতিবাচক আবেগ তাকে স্বস্তি দেয় এবং সে নতুন উদ্যোমে কাজ করার প্রেরণা পায়।

চাপ নিয়ন্ত্রণের কৌশল

শিশুকাল থেকে মানুষের ব্যক্তিত্ব ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য আবেগের সুষম প্রকাশ প্রয়োজন। এই বিকাশ সুষ্ঠু, সুন্দর ও কার্যকর করার জন্য আবেগের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। আবেগের নিয়ন্ত্রণ ছাড়া ব্যক্তিজীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ হয় না। আবেগিক জীবনকে যথাযথভাবে পরিচালনা করলে দিনে দিনে ব্যক্তি আবেগিক পরিণতি লাভ করবে এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ শিখবে। তার আচরণে সঙ্গতি থাকবে। আবেগিক আচরণ শিক্ষা দ্বারা ও অভিজ্ঞতা দ্বারা পরিবর্তন করা যায়।

আবেগিক জীবনে এমন কতগুলো আবেগ আছে যা সমাজ ও ব্যক্তি জীবনের জন্য খুবই উপকারী। যেমন, হাসি, আনন্দ, উচ্ছ্বাস, ভক্তি, শ্রদ্ধা, স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা ইত্যাদি। এদের প্রকাশ ব্যক্তি জীবন বিকাশে এবং সুষ্ঠু ব্যক্তিত্ব গঠনে সহায়তা করে। আমরা জানি, এগুলো ইতিবাচক আবেগ। ইতিবাচক এসব আবেগ মানুষের জীবনকে শান্তিময় করে তোলে। এরজন্য মানুষ তার জীবন পরিচালনায় বিভিন্নভাবে পদক্ষেপ রাখতে পারে। নিচে সেগুলো আলোচনা করা হলঃ

- **ছোটছোট খুশীর অনুভূতিতে সাড়া দেয়াঃ** ব্যক্তি জীবন পরিচালনায় নানা ধরনের প্রতিকূলতা আসে এ কথা সত্যি। কিন্তু সেসব দূরাবস্থায় হতাশ হয়ে বা ভেঙে পড়লে চলবে না। জীবনের স্বাভাবিক অবস্থা হিসেবে তাকে মেনে নিতে হবে। ঘরে বা বাইরে নিজের বা নিকটজনের ছোটখাট যেসব প্রাপ্তি ঘটে সেগুলোকে অভিনন্দিত করতে হবে এবং খুশী হতে হবে।
- **ভাল কোন কাজে আগ্রহী হওয়াঃ** সৃজনশীল ও ভাল কোন কাজে উৎসাহী হলে ব্যক্তির ভিতর উদ্যোম ও আনন্দ কাজ করে। আমরা জানি এ দুটোই ইতিবাচক আবেগ। এর প্রভাবে মানুষের মনের উৎকণ্ঠা ও হতাশাবোধ কমে যায়। প্রতিবেশী, বন্ধু বা আত্মীয়সজনের বিপদে এগিয়ে যাওয়া ও সাহায্যের হাত বাড়ানো, নিজ এলাকা বা পরিবেশের কোন দুরাবস্থা দূর করার কোন পদক্ষেপ নেয়া ইত্যাদি হল সৃজনশীল কাজ। এসব কাজ সম্পন্ন করলে ব্যক্তি গর্ববোধ করে এবং তার মনে প্রশান্তি আসে।
- **যে কোন ভাল কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখাঃ** ক্যারিয়ার গঠনে ব্যক্তি মানসিক চাপের শিকার হয়। এটি নিঃসন্দেহে একটি দুরাবস্থা। এ থেকে মুক্তি পেতে হলে ঘরে বা কর্মক্ষেত্রে নানা ধরনের কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখা একটি উত্তম উপায়। এর ফলে ব্যক্তি অসহনীয় পরিস্থিতি ভুলে থাকতে পারে এবং তার মানসিক চাপ কমে আসে।
- **বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তির সাথে ভাব বিনিময় করাঃ** নিজের দুঃখ বা গ্লানিময় কাজ বা জীবনের কথা বন্ধুকে বললে মনকে অনেক হালকা করা যায়। অনেক সময় বন্ধু তার সমস্যা সমাধানে পরামর্শ দিতে পারে। কীভাবে পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে হবে বা কোন কাজটি করলে বর্তমান অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে এ ব্যাপারে সে নির্দেশনা দিতে পারে।
- **বেড়াতে যাওয়াঃ** কারও বাড়িতে বা উল্লেখযোগ্য সুন্দর কোন জায়গায় বেড়াতে গেলে মনে স্নিগ্ধতা ও প্রশান্তি অসে। ক্যারিয়ার গঠনে ব্যক্তিকে প্রতিদিন নানা ধরনের কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। এ অবস্থা দীর্ঘদিন চললে তার জীবন

অসহনীয় হয়ে ওঠে। ফলে এক ধরনের মানসিক চাপ সে অনুভব করে। এ চাপ নিয়ন্ত্রণ করতে হলে মনে প্রশান্তি আনা বিশেষ প্রয়োজন।

- **জীবনভিত্তিক সিনেমা দেখা বা বই পড়াঃ** কবি বলেছেন "দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে"। জীবনভিত্তিক কোন কাহিনী ব্যক্তিতে দুঃখ ছাড়া সুখ লাভ হয় না এ শিক্ষা দেয়। প্রতিটি জীবনেই উত্থান-পতন আছে। সিনেমা বা বই ব্যক্তির সামনে প্রকৃত জীবন চিত্র তুলে ধরে। এর ফলে ব্যক্তি নিজের হতাশা বা দুঃখ অন্য চরিত্রের সাথে বিনিময় করে এবং তৃপ্তিলাভ করে।
- **শিক্ষা লাভের মাধ্যমেঃ** শিক্ষা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মানুষ শেখে কীভাবে দুঃখকে সরিয়ে দিয়ে জীবনকে আনন্দে পরিপূর্ণ করে তোলা যায়। জ্ঞানী এবং শিক্ষিত ব্যক্তিই সাধারণত একজন ক্যারিয়ারসম্পন্ন ব্যক্তি হয়ে গড়ে ওঠেন। শিক্ষা তাকে জীবন উপলব্ধি ও উপভোগ করতে শিখিয়েছে। সে কারণে তিনি জানেন কীভাবে আনন্দ খুঁজে পেতে হয়।

যে কোন উপায় হোক না কেন উদ্দেশ্য নিজের ভিতর মানসিক চাপ হ্রাস করা। এ উদ্দেশ্যে বিভিন্নভাবে ব্যক্তি ক্ষতিকর আবেগ দূর করে তার চাপ কমিয়ে আনতে পারে। সেইসাথে যেসব আবেগ ব্যক্তিত্ব বিকাশে সাহায্য করে সেগুলো বাড়িয়ে তুলতে পারলেই আবেগ নিয়ন্ত্রিত হয়।

কাজ - দুই

নিচের এ কাজটি আপনাকে বিভিন্ন ধরনের পরিবেশে ইতিবাচক আবেগের ব্যবহার ও মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পরিস্থিতি মোকাবেলা করার পথনির্দেশ দেবে।

সমস্যা ১ ঃ মনে করুন, আপনার দুজন সহকর্মী আপনার মত একই যোগ্যতাধারী তারা। পদোন্নতি হলে আপনাদের তিনজনের একই সময়ে একইভাবে পদোন্নতি হওয়া কথা। এ উদ্দেশ্যে আপনারা যথাযথ প্রক্রিয়ায় সাক্ষাৎকার দিয়েছেন এবং প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল আপনি ছাড়া অন্য দুজনের সময়মত যথার্থভাবে পদোন্নতি হয়েছে, অথচ আপনার হয়নি। কীভাবে এ মানসিক চাপ সামলাবেন?

সমস্যা ২ ঃ ভাবুন আপনার একজন সন্তান এস.এস.সি পাশের পূর্ব পর্যন্ত বিদ্যালয়ে লেখাপড়ায় মোটামুটি কৃতকার্য হয়েছে। আপনি নিজে যথাসম্ভব তার লেখাপড়ার খোঁজখবর করেছেন, তাকে উপযুক্ত শিক্ষকের কাছে পড়িয়েছেন অথচ এস. এস. সি ও রেজাল্ট তার আশাপ্রদ হল না। কী প্রকারে এ মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ করবেন?

সমস্যা ৩ ঃ আপনার কর্মক্ষেত্রে আপনি একজন বিভাগীয় কর্মকর্তা। আপনার উপর অনেক দায়িত্ব ন্যস্ত আছে। আগামীকাল আপনার কর্মক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী আসবেন এবং পরিদর্শন করবেন। গভীর রাতে খবর পেলেন গ্রামের বাড়িতে মায়ের শারীরিক অবস্থা বিপদজনক। আপনার মানসিক অবস্থা চরমে পৌঁছেছে। এমন একটি অবস্থায় আপনার কি করা উচিৎ বলে আপনি মনে করেন?

সমস্যা ৪ ঃ আপনার কর্মক্ষেত্রে আপনি একজন সাধারণ কর্মকর্তা। আপনার উপর বেশ কিছু দায়িত্ব ন্যস্ত আছে। হঠাৎ একদিন দেখলেন আপনার টেবিলে জরুরী কাগজপত্র আছে এমন একটি ফাইল খুঁজে পাচ্ছেন না। আপনি আপনার গৃহ ও

অন্যান্য সব জায়গায় ফাইলটি খুঁজতে লাগলেন। ২/৩ দিন পর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় আপনাকে কাগজগুলোসহ দেখা করতে তলব পাঠালেন। কীভাবে এ মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ করবেন এবং পরিচালক মহোদয়ের সাথে সাক্ষাৎ করবেন?

সারসংক্ষেপ

সুষ্ঠু ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য আবেগের সুষম বিকাশ প্রয়োজন। আবেগের নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত সুষম বিকাশের মাধ্যমে আবেগের পূর্ণতা লাভ করা যায় না। জীবনের উপর ক্ষতিকর আবেগের প্রভাব কমানো এবং সহায়ক আবেগের প্রভাব বাড়ানোই হচ্ছে আবেগ নিয়ন্ত্রণ। শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার দ্বারা ক্ষতিকর আবেগ যেমনঃ ভয়, রাগ, ঘৃণা, ঈর্ষা ইত্যাদির প্রভাব কমানো যায়। আবেগিক নিয়ন্ত্রণে ব্যক্তির উদ্দেশ্য হল ইতিবাচক আবেগিক পূর্ণতা লাভ করা। বিভিন্নভাবে ব্যক্তি এ কাজে সফল হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.১৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। আবেগ সব সময়ই কিসের সাথে যুক্ত থাকে?
ক. উদ্দীপক
খ. দৈহিক আচরণ
গ. প্রতিক্রিয়া
ঘ. ইতিবাচক আচরণ।

২। নিচের কোনটি উৎকণ্ঠার জন্য প্রযোজ্য?
ক. নেতিবাচক আবেগ
খ. হতাশা
গ. ইতিবাচক আবেগ
ঘ. সৃজনশীলতা।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। 'নতুনভাবে উদ্যোমী হওয়া ক্যারিয়ার গঠনের জন্য ইতিবাচক ভূমিকা রাখে' বিষয়টি ব্যাখ্যা করুন।

২। দৈনন্দিন জীবনে মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য আপনি কি ধরনের কৌশল অবলম্বন করবেন আলোচনা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.১৩ : ১। খ ২। ক

পাঠ-২.১৪ ক্যারিয়ার গঠনে সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতা : ভূমিকা ও কৌশল

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- সৃজনশীলতা কী তা ব্যক্ত করতে পারবেন;
- সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতা কী তা উল্লেখ করতে পারবেন;
- ক্যারিয়ার গঠনে সৃজনশীল দক্ষতার ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- কী কী কৌশল অবলম্বনে ক্যারিয়ার গঠনের ক্ষেত্রে সৃজনশীল কর্মী হওয়া যায় তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন ।

নিজের ক্ষমতা দ্বারা কোন কিছু তৈরি করাই হল সৃজনশীলতা। এটি মানুষের একটি বড় গুণ। সৃজনশীল মানুষ মাত্রই আত্মনির্ভরশীল। সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতা সম্পন্ন ব্যক্তিগণ অন্যের পথ বা মতের উপর নির্ভর করে না; বরং অন্যকে পথ দেখান। তারা নিজের ব্যক্তিগত উন্নয়নের পাশাপাশি দেশ ও জাতির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই প্রত্যেক মানুষকে সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতার অধিকারী হওয়া অত্যন্ত জরুরী। এই পাঠে সৃজনশীলতা কী, সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতা কী, ক্যারিয়ার গঠনে সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতার ভূমিকা এবং সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতা সম্পন্ন কর্মী হওয়ার কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

সৃজনশীলতা কী ?

আপনারা নিশ্চয়ই কুমোরের কাজ দেখেছেন? কুমোর কাদা মাটি দিয়ে কত নিপুণভাবে হাড়ি, পাতিল, কলসি, ঘটি, বদনা এবং অন্যান্য ব্যবহার্য জিনিসপত্র তৈরি করেন এবং নানা রকমের ডিজাইন বা নক্সা আঁকেন। আমাদের কাছে সেগুলো খুবই সুন্দর দেখায়। আমরা দাম দিয়ে কিনে ঘরে ব্যবহার করি ও সংরক্ষণ করি। নতুন নতুন জিনিস বানানোর এই যে কাজ, একে বলা হয় সৃজনশীলতা। অনুরূপভাবে রাজমিস্ত্রি, কাঠ মিস্ত্রি ও দর্জি এরা সবাইকে সৃজনশীল মানুষ বলা যায়। এরা শিল্পীও বটে। শিল্পীরাও তার হাতের রং তুলির ছোঁয়াতে নতুন কিছু তৈরি করে। যারাই নতুন কিছু তৈরি করে তারা সবাই সৃজনশীল মানুষ।

২। সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতা কী ?

বুদ্ধি খাটিয়ে কোন ঘটনা বা কোন বিষয়ে নিজের মত করে যুক্তি বা মতামত দেয়ার ক্ষমতাই হল সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতা, যা নতুন ধারণা সৃষ্টি করে। কর্মক্ষেত্রে কর্ম সম্পাদনের নতুন পদ্ধতি বানানোর সক্ষমতাই হলো সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতা। আপনারাও কোন সমস্যা সমাধানের নতুন নতুন পথ আবিষ্কার করে সৃজনশীল দক্ষতাসম্পন্ন মানুষ হয়ে উঠতে পারেন। তবে কাজটি এক দিনে হবে না, এর জন্য বহু প্রচেষ্টা ও অনুশীলন দরকার।

৩। ক্যারিয়ার গঠনে সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতার ভূমিকা

ক্যারিয়ার গঠনে সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতার ভূমিকা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। আর সৃজনশীল হতে হলে কোন বিষয়, ঘটনাকে বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার অভ্যাস করতে হবে। গতানুগতিক ভাবধারার বাইরে চিন্তা করতে হবে। শিক্ষা জীবন থেকেই সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে সঠিক ও যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করে নিজের মতামত প্রদান করতে হবে। তাড়াহুড়ো করে কোন কাজ বা সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে না। সে ক্ষেত্রে ও উর্ধ্বর্তন কর্তৃপক্ষ প্রত্যাশা করে তার অধীনস্থ কর্মী নিজস্ব চিন্তাভাবনা করে বা বুদ্ধি খাটিয়ে নতুনভাবে কাজটি/ সমস্যাটি সমাধান করুক। যারা সৃজনশীল উপায়ে বুদ্ধি খাটাতে পারে তাদের কাছে যে কোন কাজ খুব সহজ এবং অনায়াসে তা করে দিতে পারে। এ প্রসঙ্গে বিল গেটস্ এর একটি উক্তি তুলে ধরা হলো। তিনি বলেছেন "আমি যে কোন কঠিন কাজ করার জন্য অলস লোকদের নির্বাচন করি কারণ তারা অতিসহজেই কাজটি করার জন্য বুদ্ধি খাটিয়ে কঠিন কাজটি সমাধান করেন।"

তাহলে লক্ষ কর, বুদ্ধি খাটানো হচ্ছে সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতা। সুতারাং কর্মক্ষেত্রে যারা অধিক সৃজনশীল চিন্তা করতে পারবে তারাই সফলকাম হবে। কারণ এর মাধ্যমে সহজেই উপরের সিঁড়িতে পা রাখা যায়।

৪। সৃজনশীল চিন্তাসম্পন্ন কর্মী হওয়ার কৌশল

ক) নিজ নিজ ক্যারিয়ারের বিধিবিধান সম্পর্কে প্রচুর পড়াশুনা করতে হবে।
খ) গতানুগতিকের বাইরে কিছু করা বা চিন্তা-ভাবনা করা।
গ) দৈনিক সংবাদপত্রসমূহ ম্যাগাজিন, জার্নাল পড়ার অভ্যাস করা ।
ঘ) সুযোগমত নতুন ভাবনাগুলো সহকর্মীদের সাথে শেয়ার করা ।
ঙ) নতুন কোন লেখা, উপস্থাপনা ও বস্তু তৈরি করে প্রদর্শন করা।
চ) সম্পাদিত কাজ ও আরো অধিকতর ভালোভাবে নিপুণতার সাথে করার চেষ্টা করা।
ছ) নতুনভাবে যুক্তি উপস্থাপনের চেষ্টা করা।
জ) নিজ কর্মক্ষেত্রে কার্য সম্পাদনে নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করা।
ঝ) প্রতিষ্ঠানের সংকটকালীন সময়ে বহু বিকল্প পথে সমস্যা সমাধান করা।
ঞ) সহকর্মী, সহপাঠী ও ঊর্ধ্বতন অফিসিয়ালদের যুক্তভাবে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা।
ট) তথ্য ও উপাত্ত বিন্যস্তকরণের প্রক্রিয়া ও কৌশল জানা।

সারসংক্ষেপ

সৃজনশীলতা মানুষের একটি বড় গুণ। নিজের ক্ষমতা দ্বারা কোন কিছু তৈরি করাই হল সৃজনশীলতা। সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতা সম্পন্ন ব্যক্তিগণ অন্যের পথ বা মতের উপর নির্ভর করে না; বরং অন্যকে পথ দেখান। তারা নিজের ব্যক্তিগত উন্নয়নের পাশাপাশি দেশ ও জাতির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই প্রত্যেক মানুষকে সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতার অধিকারী হওয়া অত্যন্ত জরুরী। এজন্য প্রচুর পড়াশুনার পাশাপাশি গতানুগতিকের বাইরে কিছু করা বা চিন্তা-ভাবনা করা, নতুনভাবে যুক্তি উপস্থাপনের চেষ্টা করা, তথ্য ও উপাত্ত বিন্যস্তকরণের প্রক্রিয়া ও কৌশল জানা, প্রতিষ্ঠানের সংকটকালীন সময়ে বহু বিকল্প পথে সমস্যা সমাধান করা, সম্পাদিত কাজ ও আরো অধিকতর ভালোভাবে নিপুণতার সাথে করার চেষ্টা করা প্রয়েজন। তাহলেই একজন সৃজনশীল মানুষ হিসেবে নিজের ক্যারিয়ার গড়া সম্ভব হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.১৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতা বলতে কি বোঝায়?
ক) মাথা খাটিয়ে নতুন কিছু করা
খ) অন্যের কথা শুনে বলা
গ) অন্যের উপর নির্ভর করে কিছু করা
ঘ) অন্যের কিছু নকল করা

২। সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতার উদাহরণ কোনটি?
ক) অন্যের মতামত মেনে নেওয়া
খ) অন্যের ছবি নকল করা
গ) কোন কিছু মুখস্থ করা
ঘ) নতুন একটি ছবি আঁকা

রচনামূলক প্রশ্ন

ক) 'সৃজনশীলতা' কী ব্যাখ্যা করুন ।
খ) সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতার কৌশলসমূহ আলোচনা করুন ।
গ) ক্যারিয়ার গঠনে সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতার ভূমিকা বর্ণনা করুন ।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.১৪ : ১। ক ২। ঘ

পাঠ-২.১৫ সমস্যা সমাধান এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- সমস্যা সমাধানের দক্ষতা কী- ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- সিদ্ধান্ত গ্রহণের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রকারভেদ আলোচনা করতে পারবেন;
- উত্তম সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদক্ষেপগুলো বর্ণনা করতে পারবেন;
- সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের কৌশলগুলো শনাক্ত করতে পারবেন;
- অংশীদারি সিদ্ধান্ত এর সুবিধা ও অসুবিধাগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করে উত্তরণের কৌশলগুলো প্রয়োগ করতে পারবেন;
- প্রতিষ্ঠানের সমস্যা নিরসনে সঠিক সিদ্ধান্ত ও তার বাস্তবায়নে বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণে সক্ষম হবেন।

ইংরেজিতে বলা হয়, Life is not a bed of roses অর্থাৎ জীবন পুষ্প শয্যা নয়। মানুষকে তাই প্রতিনিয়ত নতুন নতুন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এসব সমস্যায় দুমড়ে-মুচড়ে গেলে জীবনে সফল হওয়া যায় না। মনে রাখতে হবে সমস্যা থাকবেই এবং তার সমাধানও আছে। এজন্য সমস্যা সমাধানের দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সামর্থ্য সবারই থাকা প্রয়োজন। বন্ধুরা এ অধ্যায়ে আমরা, সমস্যা সমাধানের দক্ষতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ধরন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব।।

সমস্যা সমাধান

জীবন চলার পথে অনেক সমস্যা আসে। এসব সমস্যা সমাধানের সামর্থ্য সবারই অর্জন করা প্রয়োজন। এসব সমস্যা বিভিন্ন রকম হতে পারে। যেমন: পারিবারিক সমস্যা, সামাজিক সমস্যা, অর্থনৈতিক সমস্যা এবং রাজনৈতিক সমস্যা। আবার কখনোবা দেখা দিতে পারে কর্মক্ষেত্রে সমস্যা। এসব সমস্যায় ভেঙ্গে পড়লে ক্যারিয়ার গঠন সম্ভব নয়। সমস্যায় পড়লে নিরসনের পথ খুঁজতে হবে। ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে কোন সমস্যা থেকে উত্তোরণের উপায় বের করাই হল সমস্যা সমাধানের দক্ষতা।

জীবন চলার পথে যে বাধাই আসুক না কেন ধৈর্য ও সাহসিকতার সাথে মোকাবেলা করার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে, Fortune favours the brave. অর্থাৎ ভাগ্য সাহসী ব্যক্তির পক্ষেই থাকে। কোন কাজে কোন সমস্যা দেখা দিলে প্রথমেই কোথায় কি সমস্যা তা সনাক্ত করা প্রয়োজন। এরপর সমস্যাটি বিশ্লেষণ করত: কেন ঘটছে, কীভাবে এর সমাধান করা যায় সে বিষয়ে গভীর চিন্তা- ভাবনা করে সমাধানের একাধিক উপায় বের করতে হয়। এর মধ্য থেকে সঠিক ও অধিক কার্যকর সমাধানটি চিহ্নিত করে দ্রুত কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

সিদ্ধান্তের ধারণা

সিদ্ধান্ত গ্রহণ একটি মানসিক ও কৌশলগত প্রক্রিয়া। একটি বিশেষ অবস্থায় কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে তা স্থির করাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বলে। সিদ্ধান্তকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: একক ও প্রতিষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত, প্রথাগত ও মৌলিক সিদ্ধান্ত এবং অংশীদারী সিদ্ধান্ত।

(ক) একক ও প্রাতিষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত

প্রতিষ্ঠানের কোন সদস্য নিজ প্রয়োজনে নিজে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তা ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। সংগঠনের প্রয়োজনে একক বা সমষ্টিগতভাবে গৃহীত সিদ্ধান্ত হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত। যেমন, সংগঠনের কোন সদস্য যদি পদত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তবে তা হবে ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। পক্ষান্তরে তার স্থলাভিষিক্ত করার লক্ষে অন্য কাউকে নিয়োগ প্রদানের জন্য একক বা

সমষ্টিগতভাবে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে তা হবে প্রাতিষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত। প্রাতিষ্ঠান প্রধান অন্য কারও সঙ্গে মতবিনিময়, আলাপ-আলোচনা ছাড়া যখন প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত কোন সিদ্ধান্ত নেন তখন তা একক সিদ্ধান্ত। কিন্তু যদি একাধিক ব্যক্তি আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ঐক্যমতের ভিত্তিতে কোন সিদ্ধান্ত নেন তখন তা হয় সমষ্টিগত সিদ্ধান্ত।

(খ) প্রথাগত ও মৌলিক সিদ্ধান্ত

রুটিন মাফিক দায়িত্ব পালনের জন্য যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তাকে প্রথাগত সিদ্ধান্ত বলে। বাধ্যতামুলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য নতুনভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের স্থান নির্বাচন হলো একটি মৌলিক সিদ্ধান্ত এবং কর্মকর্তার অফিস পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত হচ্ছে প্রথাগত সিদ্ধান্ত।

(গ) **অংশীদারী সিদ্ধান্ত**

কোন জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নিরসনে সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে আলোচনায় বসে সকলের পরামর্শক্রমে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তাকে অংশীদারিত্ব সিদ্ধান্ত বলে। সকলের সাথে কোন সমস্যা সম্পর্কে পরামর্শ করলে অনেক সময় সমস্যার নতুন নতুন বিকল্প সমাধানের সন্ধান পাওয়া যায় যা থেকে একটা উত্তম সমাধান গ্রহণ করা সম্ভব হয়। অংশীদারী সিদ্ধান্তের সুবিধাসমূহ:

* সিদ্ধান্তটা চাপিয়ে দেয়া হয়নি এবং সিদ্ধান্তটি গ্রহণে অধঃস্তনদের ভূমিকা রয়েছে-এ বোধ প্রশাসনের সাথে তাঁদের একাত্বতা সৃষ্টি করে এবং এ অবস্থায় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সহজ হয়।
* সিদ্ধান্তটি গ্রহণে সহকর্মীদের ভূমিকা রয়েছে- এ বোধ ব্যবস্থাপকের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করে এবং তাঁর পক্ষে নির্দেশ দেওয়া সহজ হয়।
* প্রয়োজনে সহকর্মীদের পরামর্শক্রমে সহজে কোন সিদ্ধান্ত পরিমার্জন বা সংশোধন করা যায়।
* প্রশাসনে গণতান্ত্রিক আবহাওয়ার সৃষ্টি হওয়ায় প্রতিষ্ঠানে কাজের অনুকূল পরিবেশ বিরাজ করে।
* মুক্তভাবে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ফলে প্রতিষ্ঠানের সকলের জ্ঞান ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

(খ) **অংশীদারী সিদ্ধান্তের অসুবিধাসমূহ**

* সাহসিকতার সাথে ঝুঁকিপূর্ণ কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ক্রমশঃ লোপ পায়।
* ব্যবস্থাপক পরনির্ভরশীল হয়ে পড়েন এবং তাঁর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সুযোগ সীমিত হয়ে পড়ে।

৩.৩ সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিবেচ্য বিষয়

একজন ব্যবস্থাপককে প্রতিষ্ঠান পরিচালনার প্রয়োজনে প্রতিনিয়তই সিদ্ধান্ত নিতে হয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নের বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন:

- শান্ত ও নিরুদ্বিগ্ন মনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত।
- একই সময়ে একাধিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রচেষ্টা না করা বাঞ্চনীয়।
- উদ্ভূত সমস্যাটির প্রতি মনোযোগী হওয়া উচিত।
- সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য পর্যাপ্ত সময় নেয়া প্রয়োজন।
- সময়মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত।
- প্রথাগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব অধঃস্তনদের ওপর ন্যস্ত করা ভালো।
- সমস্যার গুরুত্ব অনুসারে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।
- সমস্যার সমাধানে একাধিক বিকল্প সিদ্ধান্ত বিবেচনা করা প্রয়োজন।
- সিদ্ধান্ত গ্রহণে নমনীয় মনোভাব গ্রহণ করা দরকার।

সারসংক্ষেপ

মানব জীবনে সমস্যার অন্ত নাই। একের পর এক সমস্যা আসতেই থাকে। এসব সমস্যা সমাধানের দক্ষতা সবারই অর্জন করা প্রয়োজন। ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে কোন সমস্যা থেকে উত্তোরণের উপায় বের করাই হল সমস্যা সমাধানের দক্ষতা। কোন সমস্যা দেখা দিলে সমস্যাটি বিশ্লেষণ করতঃ সমাধানের সঠিক উপায় বের করতে হয় এবং দ্রুত কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ একটি মানসিক ও কৌশলগত প্রক্রিয়া। একটি বিশেষ অবস্থায় কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে তা স্থির করাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বলে। সিদ্ধান্তকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: একক ও প্রতিষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত, প্রথাগত ও মৌলিক সিদ্ধান্ত এবং অংশীদারী সিদ্ধান্ত। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে শান্ত ও নিরুদ্বিগ্ন মনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণে পর্যাপ্ত সময় গ্রহণ, উদ্ভূত সমস্যাটির প্রতি মনোযোগী হওয়া, সময়মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, সিদ্ধান্ত গ্রহণে নমনীয় মনোভাব প্রদর্শন করা, সমস্যার গুরুত্ব অনুসারে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যবস্থা নেওয়া ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় আনা প্রয়োজন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.১৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সংগঠনের প্রয়োজনে সমষ্টিগতভাবে গৃহীত সিদ্ধান্তকে কী বলে?
ক) ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত
খ) প্রতিষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত
(গ) প্রথাগত ও মৌলিক সিদ্ধান্ত
ঘ) অংশীদারী সিদ্ধান্ত

২। রুটিন মাফিক দায়িত্ব পালনের জন্য যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তাকে কী বলা হয়?
ক) অংশীদারী সিদ্ধান্ত
খ) একক ও প্রাতিষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত
(গ) প্রথাগত ও মৌলিক সিদ্ধান্ত
ঘ) ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত

রনামূলক প্রশ্ন

১। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ধারণা ব্যাখ্যা করুন।
২। সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রকারভেদ আলোচনা করুন।
৩। উত্তম সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদক্ষেপগুলো বর্ণনা করুন।
৪। অংশীদারি সিদ্ধান্ত এবং এর সুবিধা ও অসুবিধাগুলো ব্যাখ্যা করুন।
৫। সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত করুন এবং উত্তরণের উপায় নিরুপণ করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.১৫ : ১। খ ২। গ

পাঠ-২.১৬ সময় ব্যবস্থাপনা (Time Management)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- সময় ব্যবস্থাপনার কৌশল বর্ণনা করতে পারবেন;
- সময় ব্যবস্থাপনার প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত করেতে পারবেন;
- যথা সময়ে ফলপ্রসূভাবে কর্ম সম্পাদন করতে পারবেন।

সময় অমূল্য সম্পদ। সময় সুনির্দিষ্ট এবং সীমাবদ্ধ। সীমাবদ্ধ মানব জীবনে সময় ব্যবস্থাপনা তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এ অধ্যায়ে সময়, সময় ব্যবস্থাপনা, সময় ব্যবস্থাপনার কৌশল ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে।

সময় কি? (What is Time)

কোন কাজের সার্বিক সফলতা সম্পর্কে যখন আমরা চিন্তা করি, তখন সময়কে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে। সময়ের কতিপয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সময় সুনির্দিষ্ট এবং সীমাবদ্ধ। অন্য সম্পদের প্রাপ্যতার হ্রাস-বৃদ্ধি আছে কিন্তু সময়ের নেই। অন্য সম্পদ সংরক্ষণ করা যায়, সময় সংরক্ষণ করা যায় না। এমনকি অগ্রিম ব্যয়ও করা যায় না। সময় অনন্ত প্রবাহমান। মানুষ তাকে কাজের প্রয়োজনে বিভক্ত করেছে ঘণ্টা, মিনিট, সেকেন্ড ও ন্যানো সেকেন্ডে। প্রাকৃতিক নিয়মে সময় বিভক্ত হয় সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা ইত্যাদি ভাবে। সময় মেনেই গ্রহ-উপগ্রহ আবর্তিত হয় এবং পরিভ্রমণ করে কক্ষ পথে। সময় মেনেই আসে ঋতুচক্র, তৈরি হয় বর্ষপঞ্জী। এক কথায় সবকিছুই সময়ের সূত্রে গাঁথা।

সময় অমূল্য সম্পদ, সময় কারো জন্য অপেক্ষা করে না। অনেকেই সময় ব্যবহারের সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা না করেই কাজ করে থাকেন। ফলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ তাড়াহুড়ো করে শেষ করতে হয়। আবার অনেক তুচ্ছ বা অকিঞ্চিৎকর কাজের জন্য প্রচুর সময় ব্যয় করা হয়। আধুনিক যুগে সময় ব্যবস্থাপনাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হচ্ছে। কোন প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনাকে সুষ্ঠু ও কার্যকর করতে হলে সময় ব্যবস্থাপনার উপর অবশ্যই গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।

সময় ব্যবস্থাপনা কি (What is Time Management)?

সময়কে সুষ্ঠু এবং যথাযথভাবে ব্যয় করাই সময় ব্যবস্থাপনা। বাজেটের অর্থ যেমন খাতওয়ারী বরাদ্দ করা হয় তেমনি কাজের প্রকৃতি বিবেচনায় এ সময়কে বিভাজন, বরাদ্দ ও সেই অনুসারে কর্মসম্পাদন করাই হলো সময় ব্যবস্থাপনা।

সময় ব্যবস্থাপনা প্রয়োজনীয়তা (Necessity of Time Management)

বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, কম গুরুত্বপূর্ণ, তুচ্ছ বা সামান্য অর্জনের জন্য অধিক সময় আবার বৃহত্তর অর্জনের জন্য খুব অল্প সময় ব্যয় করা হয়। পরিকল্পনা মাফিক সময়ের যথাযথ ব্যবহারে অক্ষমতাই এর জন্য দায়ী। সময়ের সঠিক ব্যবহার করতে না পারলে কোন কাজই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। প্রতিষ্ঠানের কর্মপরিকল্পনা তৈরি করতে তা একাডেমিকই হোক বা প্রশাসনিকই হোক, সময়ের নির্দিষ্টতার উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। এমনকি দৈনন্দিন সময়কে ভাগ করে নিয়েই ক্লাস রুটিন প্রস্তুত করা উচিত। তাছাড়াও দাপ্তরিক কাজকর্ম, উন্নয়নমূলক প্রকল্পসমূহ প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য সময় ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব অতীব জরুরী। ব্যক্তিগত জীবনে যেমন সুষ্ঠু ও যথাযথ সময় ব্যবস্থাপনার প্রয়োগ দরকার, কর্মজীবনেও তা একইভাবে প্রযোজ্য। সময় ব্যবস্থাপনার অভাবে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জন বহুলাংশে ব্যাহত হয়। তাই অন্যান্য সম্পদের মত সময়ের সুষ্ঠু ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

সময় ব্যবস্থাপনার কৌশল (Techniques of Time Management)

যথাযথভাবে সময়ের সঠিক ব্যবহার করতে চাইলে কাজকে নিম্নলিখিতভাবে বিভাজন করে নেওয়া যেতে পারে-

গুরুত্বপূর্ণ এবং জরুরী (Important and Urgent): যে কাজ সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যন্ত জরুরী তাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। ধরা যাক, বোর্ডে বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের রেজিস্ট্রেশন ফরম পূরণ করে পাঠাবার শেষ তারিখ সামনে। এই কাজটি প্রতিষ্ঠান প্রধানকে সবচেয়ে আগে করতে হবে। দেরী করলে চলবে না। কারণ এ কাজটি একাধারে যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি জরুরী।

গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু জরুরী নয় (Important but not Urgent): অনেক কাজ খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ না হলেও তাৎক্ষণিকভাবে সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এলাকার সামাজিক কোন অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠান প্রধানকে সভাপতি করা হয়েছে। সম্মতির জন্য সামনে অপেক্ষমান ব্যক্তিকে সেই মুহুর্তেই জানাতে হবে, তিনি সেই অনুষ্ঠানে থাকতে পারবেন কি না। কাজটি খুব একটা গুরুত্ব বহন না করলেও সেই মূহুর্তে অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। কাজেই এ কাজটি তিনি জরুরী হিসেবে বিবেচনা করবেন।

অনেক সময় উপরিউক্ত তিন ধরনের কাজের মধ্যে পার্থক্য নিরুপণ করতে সক্ষম হই না। যার ফলে সময়কে সঠিকভাবে কাজে লাগানো সম্ভব হয়ে উঠেনা।

৩.৫ সময় ব্যবস্থাপনায় নিপুণতা ও ফলপ্রসূতা (Efficiency and Effectiveness of Time Management)

কোন একটি কাজ সুনিপুণভাবে সম্পন্ন করা যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন সম্পাদিত কাজটির ফলপ্রসূতা যাচাই করা। বর্তমানকালে কাজের ফলপ্রসূতা এবং কার্যকারিতা উভয়ের উপরই জোর দেওয়া হচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কোন কাজ দু'ঘন্টায় শেষ করলে খুব ভালো হয়তো হবে না, কিন্তু তা হয়তো কোন কাজে আসবে। সময় ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে তাই কর্যকারিতার স্থান নিপুণতার আগে। তবে নিপুণতা ও কার্যকারিতার সমম্বয় ঘটাতে হলে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনায় আনা দরকার:

- দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া, কর্মবিবরণী পড়া, কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করা।
- কর্মক্ষেত্রে বিজ্ঞ সহকর্মীদের সাথে পরামর্শ করে ইতিবাচক কর্ম পরিবেশ সৃষ্টি করা।
- গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা এবং অপরিহার্যতার দিক থেকে কাজগুলোকে তালিকাভুক্ত করা।
- কাজের প্রয়োজনে কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা।
- বার্ষিক পরিকল্পনা, মাসিক পরিকল্পনা ও দৈনিক কর্মসূচি তৈরি করা।
- কর্ম সম্পাদনের চিন্তা করা এবং ঠিক সময়ে কাজটি হয়েছে কি না তা মূল্যায়ন করা।
- সময় অনুযায়ী কাজটি মূল্যায়ন করা ও মান নিরূপণ করা।

সারসংক্ষেপ

সময়কে সুষ্ঠু এবং যথাযথভাবে ব্যয় করাই সময় ব্যবস্থাপনা। সময় অমূল্য সম্পদ, সময় কারো জন্য অপেক্ষা করে না। তাই প্রতিটা মুহূর্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। অনেকেই সময় ব্যবহারের সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা না করেই কাজ করে থাকেন। ফলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ তাড়াহুড়ো করে শেষ করতে হয়। আবার অনেক তুচ্ছ বা অকিঞ্চিৎকর কাজের জন্য প্রচুর সময় ব্যয় করা হয়। এতে কাজের গুণগত মান রক্ষা করা সম্ভব হয় না; আসল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়। তাই ক্যারিয়ার গঠনে লক্ষ্য অর্জনের জন্য সময় ব্যবস্থ্পনা অনুযায়ী কাজ করা অত্যন্ত জরুরী।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.১৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. সময় ব্যবস্থাপনার অর্থ কী?
ক) সময়কে নিয়ে একটি ছক তৈরি করা
খ) সময়কে ভাগ করে সেই অনুযায়ী কাজ করা
গ) এটি ব্যবস্থাপনার একটি ধরন
ঘ) সময়ের দিকে না তাকিয়ে অবিরত কাজ করে যাওয়া

২. সময় সম্পর্কে নিচের কোন উক্তিটি সঠিক?
ক) সময় বার বার ফিরে পাওয়া যায়
খ) সময় প্রবাহমান কিন্তু তাকে সংরক্ষণ করা যায়
গ) সময় সুনির্দিষ্ট এবং সীমাবদ্ধ
ঘ) সময় কর্মক্ষম ব্যক্তির পক্ষে থাকে

রনামূলক প্রশ্ন

১। সময় ব্যবস্থাপনার বলতে কী বোঝায়?
২। সময় ব্যবস্থাপনার কৌশলগুলো বর্ণনা করুন।
৩। সময় ব্যবস্থাপনার প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.১৬ : ১। খ ২। গ

পাঠ-২.১৭ শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে ধারণা ব্যক্ত করতে পারবেন।
- শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়নমূলক কার্যাবলির তালিকা প্রস্তুত করতে পারবেন।
- ক্যারিয়ার গঠনে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করতে পারবেন।

Health is wealth অর্থাৎ স্বাস্থ্যই সম্পদ। স্বাস্থ্য ভাল না থাকলে কোন কিছুই ভাল লাগে না। তাই বলা হয় স্বাস্থ্য সকল সুখের মূল। স্বাস্থ্যকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। শারীরিক স্বাস্থ্য ও মানসিক স্বাস্থ্য। উভয় প্রকার স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্য সচেতনতা অত্যন্ত প্রয়োজন। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এই পাঠে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে কীভাবে সচেতন থাকা যায় সে বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হল।

১. শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ধারণা

স্বাস্থ্য সকল সুখের মূল। মূলত স্বাস্থ্যকে সম্পদের চেয়ে বেশি মূল্যবান মনে করেন অনেক মনীষীগণ। কারণ স্বাস্থ্য ঠিক না থাকলে কোন কিছুই ভাল লাগে না। উক্ত স্বাস্থ্যকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। একটিকে বলা হয় শারীরিক স্বাস্থ্য অন্যটি হল মানসিক স্বাস্থ্য। মানুষের সকল সচেতনতার মূলে থাকা উচিত তার শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা। স্বাস্থ্যহীন মানুষের পক্ষে দেহ ও মন নিয়ে কখনোই স্বাভাবিক ও সুন্দর জীবন-যাপন করা সম্ভব নয়। কারণ শারীরিক সুস্থতার সাথে মানসিক সুস্থতার একটি সুসম্পর্ক রয়েছে। সুতরাং শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের সুনির্দিষ্ট বিধিবিধান সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা এবং সে অনুযায়ী কাজ করাই হচ্ছে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা। প্রতিটি সচেতন মানুষের শারীরিক স্বাস্থ্য সর্ম্পকিত বিধি-নিষেধগুলো জেনে অতঃপর নিজের স্বাস্থ্য সুঠাম করে গড়ে তোলার চেষ্টা করা উচিত। পক্ষান্তরে স্বাস্থ্যহীন মানুষ সমাজের বা পরিবারের বোঝা স্বরূপ। স্বাস্থ্যহীন মানুষকে অন্যেরা অনেকটা অবজ্ঞার চোখে দেখে থাকে। তাছাড়া স্বাস্থ্যহীন ব্যক্তি তার নিজ কাজ বা দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করতেও পারেন না। কারণ তার শরীর পুষ্টিহীনতার কারণে দুর্বল হয়ে পড়ে বটে। ফলে মনের দিক থেকেও সে দুর্বল মানসিকতাসম্পন্ন হয়ে থাকে। তাই সারাক্ষণ তার মন খারাপ থাকে। আর আমাদের মনে রাখা উচিত যে, অসুস্থ মানুষের কর্মক্ষমতা ও সক্ষমতা দিন দিন কমে যেতে থাকে।

২. শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়নমূলক কাজের তালিকা কর্ম

শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য বিকাশের জন্য বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম করা উচিত যাতে আমরা প্রতিনিয়ত সুস্থ ও সুখী জীবন যাপন করতে পারি। নিচে এ ধরনের কাজের একটি তালিকা প্রদত্ত হলো:

শারীরিক স্বাস্থ্য উন্নয়ন কার্যাবলি	মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়ন কার্যাবলি
১. নিয়মিত পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ	১. হাসিখুশি থাকা
২. প্রয়োজনীয় শারীরিক ব্যায়াম করা	২. পরিমিত বিশ্রাম নেয়া
৩. পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা	৩. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা
৪. স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলা	৪. পারিবারিক সুস্থ বিনোদনের ব্যবস্থা থাকা
৫. সময় মতো ঘুমানো এবং সময় মতো জেগে উঠা	৫. পড়ার অভ্যাস তৈরি করা
৬. প্রয়োজনে ডাক্তার দেখানো	৬. ধর্মচর্চা করা, সামাজিক অনুশাসনগুলো মেনে চলা
৭. পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিচ্ছেদ পরিধান করা	৭. বন্ধুত্ব, সুসম্পর্ক তৈরি করা
৮. দিনে ২ বার দাঁত ব্রাশ করা (দিনে ও রাতে)	৮. ভালো আবেগগুলো অনুশীলন করা
৯. মূলমূত্র ত্যাগের পর সাবান দিয়ে হাত ধোয়া	৯. খারাপ আবেগগুলো নিয়ন্ত্রণ করা
১০. নেশা জাতীয় দ্রব্য এড়িয়ে চলা	১০. চাপ মুক্ত থাকা, ভ্রমণ করার অভ্যাস করা

৩. ক্যারিয়ার গঠনে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনার ভূমিকা

যে জাতি যত সুস্থ, সে জাতি তত উন্নত। একইভাবে যে সমাজ যত বেশি সুস্থ ও স্বাভাবিক সে সমাজ তত এগিয়ে আছে। কারণ কোন কাজ সুন্দর ও সুষ্ঠু সুচারুরূপে করার বিকল্প নাই। তাই পারিবারিক কাজ, পড়ালেখা কিংবা চাকরি ক্ষেত্রে সর্বত্রই শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন থাকার বিশেষ গুরুত্ব অপরিহার্য। যারা ভগ্ন স্বাস্থ্যের অধিকারী তাদের মন মেজাজ খিটখিটে থাকে, কোন কাজে তার মন বসে না, ধৈর্যের সাথে সে কোন কাজ সময়মত সম্পন্ন করতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ একজন শিক্ষার্থী যদি পরীক্ষার পূর্বে সুস্থ থাকতে পারে, তাহলে সে ভালভাবে প্রস্তুতি নিয়ে পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করতে পারে। কোন মৌখিক (Viva) পরীক্ষার পূর্বে যদি কোন পরীক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে পড়ে তাহলে চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা তার অনেকাংশে কমে যায়। কারণ প্রশ্নকর্তা প্রশ্ন বুঝে জবাব দিতে তার পক্ষে প্রায়ই সম্ভবপর হয়ে উঠে না। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে রুগ্ন বা স্বাস্থ্যহীন চাকরি প্রার্থীকে চাকরিই দেওয়া হয় না। কারণ সেক্ষেত্রে চাকরি প্রার্থীর শারীরিক ও মানসিক যোগ্যতা (Suitability Test) যাচাই করে দেখা হয় যে, উক্ত প্রার্থী কাজটি করতে কতটুকু সক্ষম। সুতরাং ক্যারিয়ারে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য প্রচুর পরিশ্রম প্রয়োজন। এ সময় শরীর ও মন সুস্থ না থাকলে সকল পরিকল্পনা পণ্ডশ্রম হতে পারে। অতএব, এখন থেকেই আমাদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার জন্য অধিকতর যত্নবান ও সচেতন হওয়া উচিত।

কাজ-১ : আপনার এলাকায়/ মহল্লায়/ পরিবারে যারা নিয়মিত স্বাস্থ্যবিধি মানে না- তাদের জন্য করণীয় কী? তা একটি পোস্টার কাগজে উপস্থাপন করুন।

সারসংক্ষেপ

স্বাস্থ্য ভাল না থাকলে কোন কিছুই ভাল লাগে না। তাই বলা হয় স্বাস্থ্য সকল সুখের মূল। স্বাস্থ্যকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। শারীরিক স্বাস্থ্য ও মানসিক স্বাস্থ্য। মানুষের সকল সচেতনতার মূলে থাকা উচিত তার শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা। স্বাস্থ্যহীন মানুষের পক্ষে দেহ ও মন নিয়ে কখনোই স্বাভাবিক ও সুন্দর জীবন-যাপন করা সম্ভব নয়। কারণ শারীরিক সুস্থ্যতার সাথে মানসিক সুস্থতার একটি সুসম্পর্ক রয়েছে। সুতরাং শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের সুনির্দিষ্ট বিধিবিধান সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা এবং সে অনুযায়ী কাজ করাই হচ্ছে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা। প্রতিটি সচেতন মানুষের শারীরিক স্বাস্থ্য সর্ম্পকিত বিধি-নিষেধগুলো জেনে অতঃপর নিজে স্বাস্থ্য সুঠাম করে গড়ে তোলার চেষ্টা করা উচিত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.১৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়নমূলক কাজ কোনটি?
- ক) দিনে ২ বার দাঁত ব্রাশ করা
- খ) নিয়মিত পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ
- গ) মূলমূত্র ত্যাগের পর সাবান দিয়ে হাত ধোয়া
- ঘ) হাসিখুশি থাকা

২। শারীরিক স্বাস্থ্য উন্নয়নমুলক কাজ কোনটি?
- ক) ধর্মচর্চা করা, অনুশাসনগুলো মেনে চলা
- খ) খারাপ আবেগগুলো নিয়ন্ত্রণ করা
- গ) নিয়মিত পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ
- ঘ) হাসিখুশি থাকা

রচনামূলক প্রশ্ন

১. শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য বলতে কী বুঝায়।
২. ‘স্বাস্থ্য সকল সুখের মূল’- উক্তিটি ব্যাখ্যা করুন।
৩. ‘স্বাস্থ্য কীভাবে সম্পদে পরিণত হয়, তা বিশ্লেষণ করুন।
৪. ক্যারিয়ার গঠনে সুস্বাস্থ্যের সচেতনতাবোধ কীভাবে সহায়ক- আলোকপাত করুন।
৫. শারীরিক স্বাস্থ্যের সাথে মানসিক স্বাস্থ্যের সম্পর্ক নির্ণয় করুন।
৬. সুস্থতার জন্য একজন শিক্ষার্থীর কী কী করণীয় তার একটি তালিকা তৈরি করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.১৭ : ১। ঘ ২। গ

পাঠ-২.১৮ নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গি : গুরুত্ব ও উপায়

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গি কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।
- ক্যারিয়ার গঠনে নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন হওয়ার উপায় বর্ণনা করতে পারবেন।

মানুষ সুন্দরের পূজারি। মানুষের চোখ সর্বদাই সুন্দরের দিকে আকৃষ্ট হয়। তাই প্রাত্যহিক প্রতিটি কাজ এমন সুন্দরভাবে গুছিয়ে করা প্রয়োজন যা নিজেকে এবং অন্যকে আনন্দ দেয়। সকালে ঘুম থেকে উঠে মশারী ভাজ করা থেকে শুরু করে, খাওয়া- দাওয়া, দাঁত ব্রাশ, লেখাপড়া, ঘর গেছানো, সঙ্গীত চর্চা, আবৃত্তি অনুশীলন করা ইত্যাদি প্রতিটি কাজ সুন্দর করে করার মত নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রত্যেকেরই গঠন করা প্রয়োজন। আর এ নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গি ক্যারিয়ার গঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

বন্ধুরা, আসুন আমরা প্রথমেই জেনে নেই নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গি কী? একটি উদাহরণ দিয়ে আলোচ্য বিষয়টির গুরুত্ব তুলে ধরা যাক। ধরুন আপনি সিলেটের জাফলং বেড়াতে গেলেন, সেখানে কী দেখলেন? দেখলেন খর স্রোতা নদী, নদী থেকে পাথর তোলার দৃশ্য, সিলেটের চা বাগান, জাফলং নদী পার হয়েও দেখলেন আদিবাসীদের জীবন-যাপন, দেখলে অনতিদূরেই ভারতের মেঘালয় পাহাড় যেন ঘুমিয়ে আছে- এসব প্রাকৃতিক দৃশ্য আপনার কাছে মনোমুগ্ধকর লাগলো, তাই-না? নতুন কিছু দেখা, নতুন জায়গায় বেড়ানো সবারই ভাল লাগে। এটা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। ছবি দেখলে ভাল লাগে, গান শুনলে ভাল লাগে, মিষ্টি ফুল দেখলে ভাল লাগে, ঝরণার রিনিঝিনি শব্দ শুনে আমরা মুগ্ধ হই। এসব আমাদের জীবনের অভিজ্ঞতার কথা। জীবনের কোন না কোন সময়ে আমরা এই আনন্দ অনুভব করি। আর 'আনন্দ' থেকেই 'নন্দন' কথাটির উদ্ভব হয়েছে। এটি জার্মান শব্দ থেকে গৃহীত হয়েছে। ১৯৩৪ সালে জার্মান দার্শনিক আলেকজান্ডার গটলিয়েব বামগার্টেন সৌন্দর্য্যবিদ্যার জন্য এই শব্দটি ব্যবহার করেন। নন্দন এর আধুনিক ইংরেজি প্রতিশব্দ হল Aesthetics, যা জার্মান থেকে এসেছে। সুতরাং 'নন্দন' শব্দের অর্থ দাড়ায় যা থেকে আনন্দ পাওয়া যায় বা যা সৌন্দর্য্য বর্ধন করে। অন্যভাবে বলা যায়, যে কোন কাজ করার ক্ষেত্রে তা সুন্দর করে করা, গুছিয়ে করা, যা চোখে দেখলেই সুন্দর মনে হয়, তাকেই নান্দনিকতা বলে। এই নান্দনিকতা হতে পারে শিল্পের ক্ষেত্রে; তেমনি হতে পারে কাব্য চর্চার ক্ষেত্রে। এমনকি প্রাত্যহিক জীবনের ছোটখাট কাজ যেমন ঘর গুছানো, সুন্দর করে কাপড় পরিধান করা, একটু সাজুগুজু করা, চুলের খোপাতে ফুল গুজে দেয়া, সুন্দর নক্শা রচিত পিঠা তৈরি করা ইত্যাদি নান্দনিক কাজের উদাহরণ। সুন্দর করে কথা বলা, সুন্দর হস্তাক্ষর, বা সুন্দরভাবে উপস্থাপন করায় যে উপলব্ধিবোধ (Feelings) বা মনোভাব, রুচিবোধ তাকে নান্দনিকতা দৃষ্টিভঙ্গি বলা হয়।

নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্ব

শিল্পরসের আস্বাদনের আকুতিটুকু থাকলে মানুষের মনে শিল্পের সহানুভূতির বোধন ঘটে। আমরা পীড়াবোধ করি। এটি একটি 'মহৎ ক্ষুধা'। এই মহতী ক্ষুধার তাড়নায় কবি, সাহিত্যক, শিল্পীগণ সৃষ্টি চঞ্চল হয়ে উঠেন- রচিত হয় মহাকাব্য, আমরা আনন্দিত হই, আর উপভোগ করি তার স্বাদ। বাংলা নববর্ষে যেভাবে সাজানো হয়; এদেশের রাস্তাঘাট, দোকানপাট, জ্বলজ্বল করে বৈদ্যুতিক বাতি এসবই নন্দন বর্ধনের জন্য করা হয়। মানুষের মধ্যে যারা সুন্দরের চর্চা করেন তাদের জীবনবোধ, রুচিবোধ (Stylish এবং Fashionable) মার্জিত এবং সর্বজন নন্দিত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ হিসেবে পরিচিত হন। সেজন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নন্দন চর্চা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ক্যারিয়ার গঠনে নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গির সম্পন্ন হওয়ার উপায়

ফুটন্ত ফুলকে সবাই ভালবাসে কারণ ফুলের সুবাস আছে। ঠিক তেমনি সুন্দর কাজকে সবাই পছন্দ করে। ধরুন, আপনার বন্ধু রুবাবের হাতের লেখা খুবই সুন্দর এবং পরিপাটি; তার উপস্থাপনা আরও সুন্দর। তাহলে শিক্ষক তাকে একটু অন্যরকমভাবে মূল্যায়ন করবেনই। ঐশি তার সুন্দর হস্তাক্ষরের জন্য অন্যদের চেয়ে একটু বেশি নম্বর পাবেই, তাই নয় কি? তাহলে লক্ষ করুন যে, ক্যারিয়ার গঠনে নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গি কতটা সহায়ক। নিচে নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন হয়ে ওঠার কতিপয় উপায় দেওয়া হল:

- সব সময় কথাগুলো গুছিয়ে বলা।
- অর্পিত কাজ ও দায়িত্বগুলো সুন্দরভাবে করা ।
- সহপাঠীদের সাথে ভাল আচরণ করা।
- রুচিশীল পোষাক-পরিচ্ছেদ পরিধান করা
- নিয়মিত চুল ছাটানো এবং নখ ও ত্বকের যত্ন নেওয়া
- সৌন্দর্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তিকে অনুকরণ করা।
- নিজের পড়ার টেবিল-বইপত্র, বিছানাও ব্যক্তিগত কাপড়-চোপড় আলনাতে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা।
- কর্মক্ষেত্রে ফাইলপত্র সুন্দরভাবে উপস্থাপন ও সংরক্ষণ।
- 'চারু ও কারু'- এর কাজ করা
- সঙ্গীত, সাহিত্য ও আবৃত্তি অনুশীলন করা।
- বুদ্ধিদীপ্ত ও সৃজনশীল কাজে আগ্রহ থাকা।

সারসংক্ষেপ

আর 'আনন্দ' থেকেই 'নন্দন' কথাটির উদ্ভব হয়েছে। সুতরাং 'নন্দন' শব্দের অর্থ দাঁড়ায় যা থেকে আনন্দ পাওয়া যায় বা যা সৌন্দর্য্য বর্ধন করে। অন্যভাবে বলা যায়, যে কোন কাজ করার ক্ষেত্রে তা সুন্দর করে করা, গুছিয়ে করা, যা চোখে দেখলেই সুন্দর মনে হয়, তাকেই নান্দনিকতা বলে। এই নান্দনিকতা হতে পারে শিল্পের ক্ষেত্রে; তেমনি হতে পারে কাব্য চর্চার ক্ষেত্রে। এমনকি প্রাত্যহিক জীবনের ছোটখাট কাজ যেমন ঘর গুছানো, সুন্দর করে কাপড় পরিধান করা, একটু সাজু গুজু করা, চুলের খোপাতে ফুল গুজে দেয়া, সুন্দর নক্শা রচিত পিঠা তৈরি করা ইত্যাদি নান্দনিক কাজের উদাহরণ। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নন্দন চর্চা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এই নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গি ক্যারিয়ারের বিকাশে বিশেষভাবে সহযোগিতা করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.১৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। নন্দন বলতে কী বোঝায়?

ক) সুন্দর করে ছবি আঁকা
খ) নক্সী কাঁথা তৈরি
গ) রুচিশীল পোষাক-পরিচ্ছেদ পরিধান করা
ঘ) যা থেকে আনন্দ পাওয়া যায়

২। 'নন্দন' শব্দটির উৎপত্তি কোন শব্দ থেকে?

ক) Aesthetics
খ) Athletics
গ) Amusement
ঘ) Essence

৩। নন্দন কথাটির উদ্ভব হয়েছে বাংলা কোন শব্ধ থেকে?

ক) স্বাচ্ছন্দ
খ) আনন্দ
গ) ছন্দ
ঘ) দ্বন্দ্ব

রচনামূলক প্রশ্ন

- ‘নন্দন’ শব্দটির অর্থ কী?
- ‘নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গি’ বলতে কী বুঝায় ব্যাখ্যা করুন।
- ‘জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সুন্দরের চর্চা করা উচিত’- উক্তিটি বিশ্লেষণ করুন।
- ক্যারিয়ার গঠনে নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজনীয়তা কতুটুকু আলোচনা করুন।
- নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন হয়ে উঠার উপায় বর্ণনা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.১৮ : ১। ঘ ২। ক ৩। খ